রুশতী পঞ্চাশতী

বিষ্ণু দে

রুশতী পঞ্চাশতী

রুশতী পঞ্চাশতী

বিষ্ণু দে

মনীষা ॥ কলিকাতা
১৯৬৭

প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬৭

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রকাশক
তরুণ সেনগুপ্ত
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি
প্রাইভেট লিমিটেড
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

তিন টাকা

এই কবিতাগুলি দেশেবিদেশে ঘটনায় বা কোনও না কোনও উপলক্ষ্যে লেখা হয়েছিল। তারিখ অনুসারে ঠিক সাজানো যায় নি, কারণ তারিখ সবসময়ে লেখা হয় নি।

মনীষা যে এই পঞ্চাশটি ভালো-মন্দ কবিতা সোভিএট বিপ্লবের পঞ্চাশৎ-বার্ষিক উৎসবে প্রকাশ করছেন, তার জন্য আনন্দিত বোধ করছি : তাঁদের সঙ্গে আমিও এই মহোৎসবে সাধ্যমতো যোগদানের সুযোগ পেলুম—প্রত্যেকের কাছ থেকে তার যা সাধ্যে কুলোয়।

বিষ্ণু দে

সূচীপত্র

রুশতী পঞ্চাশতী

সার্থকের বরেণ্য উষায় রুশদ্বৎসা রুশতীর ভর্গে জগৎহিতায় ঋণশোধে স্নায়ুতে অপার প্রাত্যহিক আত্মস্থতা আবিশ্ব প্রসাদ।

রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধূ অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে॥

অনুজের গান

দুঃসহ জালা শৈশব যৌবন,
আমাদের কাল দুর্বহ অনুখন।
কত দুর্যোগ, কত দুর্ভোগ যায়!
বিরাট কালের বিপুল তেপান্তরে
তোমার প্রাণের হাজার ঝুরির বরে
হাতছানি দেখি তোমারই পিপুলছায়ে—
প্রাণ পায় মৃত কৈশোর যৌবন।

মোহিনীর নয়, মানুষেরই নির্মাণ—
মাটির মানুষ, মানুষের সম্মান!
একাগ্র চোখে সদাসতর্ক কাজ,
প্রখর হৃদয়, লেনিনের মনপ্রাণ
আকাশবিহারী ক'রে দিলে যৌবন।

তাই সব শুনি সে নক্ষত্র-গান,
গঙ্গায় পাই ভল্‌গার প্রতিমান!
আমাদের রাত আমাদেরই দিন মানি,
কুহক তো নয়, সহোদর হাতে আনি
তোমাদের হাতে অনুজের যৌবন!

জ্যেষ্ঠ! তোমরা গড়ে দিলে প্রতিভাস,
তাই আমাদের গঙ্গার চরে চরে
স্বপ্নের বানে গড়ে তুলি ইতিহাস
উজ্জীবনের দগ্ধ তেপান্তরে।
দুস্থ জঙ্ঘ হোক না বর্তমান,
এক নীলাকাশ দুই দেশে করে গান।
মৈত্রীতে বাঁধো আমাদেরও যৌবন॥

১৯৪৭

২২শে জুন ১৯৪১

পথে আজ লোক কম, মধ্যবিত্ত ল্যাম্পপোস্ট প্রাণভয়ে ক্ষীণ,
পলাতক উদরের উনুনের ধোঁয়া নেই, স্বচ্ছ চন্দ্রালোক !
অন্তহীন নীল আলো ঝরে যায়, গাঢ় নীল আকাশে সঙ্গীন
পূর্ণিমার ভয়াবহ চন্দ্রালোক ! শত্রুদের পুষ্পকচালক
শুনেছি হদিস্ পায় গৃহস্থ এ পূর্ণিমায়, তবু দেখি ঝরে
স্তরে স্তরে অবিরাম প্রাণান্তিক নীল আলো। প্রাণের চূড়ায়
মৃত্যুর মহিমা চাই, অজ্ঞ অপঘাত নয় ; আবিশ্বসমরে
অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা কুড়ায় !

জনগণমনে অধিনায়কের শূন্য স্থান, পূর্ণ করো বীর !
সেয়ানে সেয়ানে হোক্ কোলাকুলি সংগোপনে ; তবু চীন, রুশ্—
দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
স্বার্থের বর্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির
জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, ভারতেরও ভিত টলে, প্রাণের নির্দেশে
কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা ঝাড়ে দূর দেশে দেশে ॥

প্রতিরোধ

(টিখোনভের ১৯২২ অবলম্বনে)

ভুলেছি আজকে ভিক্ষাদানের মধ্যবিত্ত পুণ্য,
সাগর-তীরের হোটেলে লবণ-আঘ্রাণ বিলাসিতা,
হিমালয়ে নেই সূর্যোদয়ের শান্ত-শীতল সুখ,
ভুলেছি দুহাতে কেনাকাটা আজ দোকানীর নানা পণ্য।

আজকে নেহাৎ কদাচিৎ দেখি জাহাজের আনাগোনা,
রেলপথে তবু চলে বটে কিছু ওয়াগনের লেন্‌দেন্‌,
তবুও বিরাট ভারতের পথে গ্রামে ও শহরে গোনো
—হাজারে হাজারে আধমরাদেরও মাথা ঝেড়ে ডাক শোনো—

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য ॥

ভীরু হাত পাতি

আল্‌গা মাটির হাল্‌কা হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল
মানসলোকের বাসিন্দা যত তনুহীন গম্বুজে।
মরাল দীঘির পদ্মকাননে ঢোকে যে হাতির পাল,
অর্থগৃধ্নু অস্ত্রগৃধিনী ছিঁড়ে খায় অম্বুজে।
বাণপ্রস্থে বৃদ্ধ যযাতি, উধাও উজীর পিছে,
কোটাল পিটায় কপাল নিজের, কোথা কোটালের বান!
মূষিকবিবর খোঁজে সদাগর, চোর ঘুরে মরে মিছে,
আমাদের কাণা ক'রে সব পুরসুন্দরী গ্রামে যান।

দুর্দিন আসে লেলিহরসনা। পাগ্‌লা হাতির পাল
ছুটেছে অর্থগৃধ্নু অস্ত্রমাতালের অঙ্কুশে।
যুগান্তে আজ ছিঁড়ে যায় বুঝি আল্‌গা মাটির কাল—
নবজীবনের বীজবপনের প্রাণ-হারানোর ক্রুশে।
ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল।
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও, মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল।

২২শে জুন ১৯৪২

They, like Antæus, are strong because they maintain connection with their mother, the masses, who gave birth to them, suckled them and reared them.—*Stalin.*

শতাব্দীরা উর্ধ্বশ্বাস, জটায়ুর পক্ষপাত নীল
আকাশে মুখর হল, প্রাতঃসূর্যে রক্তাক্ত লড়াই
প্রাণে আজ আভা ফেলে, মৃত্যুঞ্জয় জনতার মিল
মিলায় বাহির-ঘর, ছিঁড়ে যায় বর্ধিষ্ণু বড়াই।
মানুষে মানুষে আজ হাত বাঁধে, হয়ে যায় ছাই
শ্রেষ্ঠীর খাতাঞ্চিখানা, সামন্তেরা দ্বারে তোলে খিল,
পরস্বক্রিমিরা আজ বুদ্ধিভ্রংশে করে কিল্‌বিল্‌।

নীলকণ্ঠ ইতিহাসে বহুদীর্ঘ উৎরাই-চড়াই
কৈলাসে হয়েছি পার। চোখে জাগে নবীন সভ্যতা,
অজেয় প্রাণের অগ্নি, রক্তাক্ত সে জনতার হাতে
মৃত্তিকাসন্তান যারা, মৃত্যুহীন, যুগান্তসাক্ষাতে
নির্ভীক, কর্মিষ্ঠ যারা। তাই আজ উচ্ছ্বসিত কথা
আমাদেরও, মৃত্যুহীন সমাজের করি জয়গান
উজবেক্‌, তাজিক্‌, তুর্কী, কাজাক্‌— ও দূর হিন্দুস্থান॥

লেনিনস্তোত্র

(ল্যাংস্টন হিউজ অবলম্বনে)

রুশদেশের কমরেড লেনিন !
পাথরের কবরে শয়ান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন !
আমাকে যে দিতে হবে স্থান ।

আইভ্যান আমি চেনা চাষী,
মাটিমাখা দুই পা আমার,
লড়েছি তোমারই সাথে সাথে,
কাজ সারা হয়েছে এবার ।

রুশদেশের কমরেড লেনিন
পাথরের কবরে অম্লান !
পাশ দাও, কমরেড লেনিন !
আমাকে যে দিতে হবে স্থান ।

চিকো আমি কালো কাফ্রি চিকো,
রৌদ্রে আখ কাটি মুঠি মুঠি,
বেঁচেছি তোমারই তরে কমরেড,
আজকে আমার হ'ল ছুটি ।

রুশদেশের কমরেড লেনিন !
কবরেও অক্ষয় সম্মান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন !
আমাকে যে দিতে হবে স্থান ।

চাং আমি, লোহাশাল থেকে
শাংহায়ের পথে ধর্মঘটে
বিপ্লবের তরে অনাহারে
লড়ি, মরি, ডরি না সংকটে ।

রুশদেশের কমরেড লেনিন,
জাগ্রত সে পাথরে শয়ান।
জনযোদ্ধারা হুঁশিয়ার,
দুনিয়াই আমাদের স্থান ॥

খার্কভ

শয়ান রয়েছি স্থির
শুভ্র স্তব্ধ কাফ্নের মাঝে।
আমার নিঃশ্বাস ধীর
শুধু কি আমারই কানে বাজে?

প্রাণের মিলিত ছন্দে
আজ বুঝি উপাড়ে না ঘাস,
ছেঁড়েনাকো ক্ষেতের আগাছা।
ট্রেঞ্চ-কাটা বনানীর গন্ধে

আকাশের অসীম হাওয়ায়
কাঁপেনাকো মাংসল নিঃশ্বাস?
কখনো কি শেষ হয় বাঁচা
স্বচ্ছ স্রোতে সবুজ ছায়ায়?

সাঁকো আর ভাঙেনাকো বাহু
গড়েনাকো ত্বরিতে পন্টুন?
তবু অবিনশ্বর আয়ু
যে সূর্যের রক্তাক্ত আকাশে

ডুবে যায় বিবর্ণ শকুন।
প্রাণের সমুদ্র থেকে ভাসে
প্রথম রাতের লাল তারা।
ফসলের সোনালি প্রহরে

অবকাশ কণ্ঠরোধ করে
প্রেমের আবেশে দিশাহারা
জীবনের চরম বিশ্বাসে
সম্পূর্ণ আমারই নিঃশ্বাসে॥

২২শে জুন ১৯৪৪

তোমাদেরই ঐক্যতানে বিলম্বিত মেলে বহু তাল
বিশটি বছর বিশ্ব দেখে গেল বিস্মিত নির্মাণ
সাম্রাজ্যচণ্ডীর মুখে, চারিপাশে বাণিজ্য-দালাল
তারই মাঝে সভ্যতার শ্রেণীহীন মনুষ্যত্ব দান !
বহুভাষী বহুধর্মী ছিন্নভিন্ন বর্বর যে রুশ
বিশটি বছরে হল শুভবুদ্ধি বিজ্ঞানে প্রবীণ !
তারপরে রক্তস্নাত প্রাণোৎসর্গে যে হাজার দিন
তোমরা দিয়েছ, বিশ্বে ছেয়েছে সে অমর পৌরুষ ।

দেশে দেশে সাড়া পড়ে, মিত্র জাগে শত্রুর শিবিরে
মিলটনের ভ্রষ্টস্বর্গ শৃগালশিকারী ছোট দ্বীপও
সোভিএট্ গান ধরে, সৈন্যদল সাজে অবশেষে,
জেগেছে ফরাসী হাস্য আলজীরের ঊষার তিমিরে,
তিতোর পতাকা বহে সাম্রাজ্যপুতলি বহু নৃপ,
মানবমর্যাদা শোনো ঐক্যতানে এ উপনিবেশে ।

৭ই নভেম্বরে

আকস্মিক ঘটনায়, দৈবচক্রে, অর্থের উৎপাতে
পুরুষার্থ নির্ণীত যে সমাজের উঁচু-নিচু স্তরে,
সেখানে জুয়াড়ী স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃধ্নুর ভিড়ে মাতে,
মানুষ সেখানে শুধু ছিনিমিনি কড়িকেনা দরে।
যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর
অপচয়ে অন্ধকার, মনুষ্যত্ব তুচ্ছ সে বৈভবে।
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্যলক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে।

স্বাধিকারে মুক্তি আজ, ন্যায়যুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন।
এবারে আরম্ভ হ'ল মনুষ্যত্বে প্রাণের মনের
ক্ষুরধার দ্বন্দ্ব আর সমাধা-সাধনা, শ্রেণীহীন
সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়। শ্রমিকজনের
সাগরসংগমে আজ উৎসৃজিত রুশ জনগণ!
তোমাদের ভগীরথ— বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন॥

১৯৩৮

উপহার

(ব্রের্টোল্‌ট ব্রেখ্‌ট অবলম্বনে)

সৈনিক বধূ অবাক, খুলল মোড়া,
নজর পাঠায় প্রাচীন শহর প্রাগ্‌!
উঁচু খুর-ওলা জুতা এযে এক জোড়া—
অবাক করলে পুরানো শহর প্রাগ্‌!

সৈনিক বধূ মোড়া খোলে চুপি চুপি
সাগর পারের অসলো পাঠাল কিবা?
পাঠিয়েছে স্বামী সরেশ লোমের টুপি—
ফুর্তিতে হাসে আর্য শিবের শিবা।

সৈনিক বধূ অবাক নয়নে দেখে,
এমস্টার্‌ডাম পয়সার দেশ বটে,
হীরার আংটি পাঠাল সেখান থেকে—
শাদা চামড়ায় মানাবে তা বেশ বটে।

সৈনিক বধূ অবাক হ'য়েই থাকে,
ব্রাসেল্‌স শহর বড়োই সে শৌখিন!
দামী দামী লেস্‌ ব্রাসেল্‌স পাঠায় ডাকে—
কিবা সাজগোজ চলবে সারাটা দিন!

সৈনিক বধূ বিস্মিত, ভাবে বামা,
প্যারিসের আলো চক্ষু জ্বালায় তার
ফ্যাশন-স্বর্গ পাঠাল রেশমী জামা—
চরম এ শখ জেগেছে কত না বার!

সৈনিক বধূ সুখে ভাবে চোখ বুজে
বুখারেস্ট থেকে ব্লাউস যে উপহার,

পাঠায় আবার স্বামী তার খুঁজে খুঁজে
নকশার কাজ, রঙের কি যে বাহার !

নাৎসির বৌ আবার অবাক চেয়ে—
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার !
বিধবার কালো ঘোমটা পাঠাল কে এ
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার !

বসন্ত ১৯৪৪

(পাস্টেরনাক)

এবার ফাল্গুনে সব কিছুতেই নূতনের স্বাদ।
চড়ায়ের দল করে কলরব আরো প্রাণবন্ত।
সে কথা বলাও বৃথা চেষ্টাও বৃথা করব না—
আমার হৃদয় আজ কী উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত।

আমার ভাবনাচিন্তা লেখাপড়া একেবারে ভিন্ন,
সম্মিলিত সংগীতের উচ্চ স্বরগ্রামে তীব্র বাজে
পৃথিবীর পরাক্রান্ত কণ্ঠস্বর, ঐ শোনা যায়
মুক্তিজাত বহু দেশ উন্মুখর গম্ভীর আওয়াজে।

ফাল্গুনের শ্বাস এই আমাদের দেশে ব'য়ে যায়,
শীতের ছাপের কালি মুছে দেয় আকাশে প্রান্তরে
আর ধুয়ে ধুয়ে দেয়— কালিমার রেখা অশ্রুময়
বহু স্লাভ্ মুখ থেকে বহু লাল চোখের নির্ঝরে।

ঘাস-ও দেখি থরোথরো সর্বত্রই প্রকাশে উন্মুখ,
যদিও প্রাচীন প্রাগে আজও অলিগলি রুদ্ধস্বর,
আঁকাবাঁকা গলি যত প্রত্যেকটি বাঁকা অলিগলি
এবারে ফুটবে স্বরে, খাল-বিল-নদীও মুখর।

চেক্ ও মোরাভী আর সার্ব্ যত প্রতিবেশী আছে
ফাল্গুনের সুকুমার হাতে যারা উজ্জীবিত জাগে,
তাদের কাহিনী আজ ছিঁড়ে ফেলে অবৈধ গুণ্ঠন,
ফুটে ওঠে কুঁড়ি-ফুলে পলাতক তুষারের আগে।

এসবই মসৃণ হবে রূপকথার কুহেলি-আলোয়,
যেমন সুবর্ণ কক্ষে, যেখানে থাকত বয়ারেরা,

ঝিকিমিকি নকশা জলে প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে,
কিংবা সন্ত বাসিলের মন্দিরের গায়ে চিত্র-ঘেরা।

গভীর রাত্রিতে জাগে স্বপ্নময় নিবিষ্ট ভাবুক
মস্কভা, যে প্রিয়তমা সারা বিশ্বে। আপন যৌতুকে
সকল কিছুর ঘর বাঁধে সে যে, কালের দয়িতা!
শতাব্দীরা মুকুলিত হবে তারই স্নেহের কৌতুকে ॥

কোডা

পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রাণের মায়া !
সান্ধ্য-সভায় রক্ত-আভায় বাড়ির ছাদে
একাকার দেশ-বিদেশের গান, হারায় কায়া
তিস্তার স্রোত সাহারায়, দূর স্তালিন্‌গ্রাদে
বাংলা দেশের প্রান্ত মিলায়, মাটির ছবি
মরণের টানে গৃধ্নু রেখায়, বিসংবাদে
উজ্জীবনের সমাধান হানে, অস্তরবি
রক্তের মেঘ ছড়ায় ঊষায়, প্রবল আশা
ভগ্নদূতের মুখে জাগে, তাই প্রাণের কবি
অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীর ভাষা ;

কলকাতা গায় আসামের দূর নীল আঁধারে,
চোখে জাগে যেবা উৎসব, সেই সভায় পাশা
খেলেনাকো কেউ, মাথা কোটেনাকো লোভের দ্বারে,
মানুষের মনে কার্য-কারণ স্বাধীন সেথা,
জীবিকার শূলে চড়ে না জীবন অত্যাচারে।
সে-জনারণ্যে পলাতক আমি বিদুর যেথা
খুদের কণায় ক্ষুধাকে মেটায় পরমজ্ঞানে।
হয়তো সেখানে ঘটেছে ভ্রান্তি, ভেঙেছে কেতা
জানি যুযুৎসু প্রাবল্যে, হঠকারীর ধ্যানে ;

রাত্রির এই নীলের বিরাটে বিমানগানে
তারায়-তারায় ছড়ায় প্রাণের যে-সংহতি
সেই একতার অর্কেস্ট্রার সমসমাজের
সংগীতে ডোবে অন্যমনারও আত্মরতি,
পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রবল বাজের
পাঞ্চজন্যে পড়ে না যে তাই বারেকও যতি।

দ্বৈতাদ্বৈতে কম্বুরেখায় প্রাণের কাজের
ইতিহাস চলে অমোঘ আবেগে, ছড়ায় বাধা
পাইন বনের বাতাসের মতো, হিংস্র বনে
কাঠুরিয়া চলে, বসতি বসায়, পাহাড়ে সাধা
নগরগ্রামের পত্তন গড়ে, তাই জীবনে
জীবিকার গ্লানি ছিঁড়ে ফেলে গায় নূতনা রাধা :

তবু তারা বেঁচেছিল কড়িকেনা দাসদাসী নামহীন চাষী ও মজুর

বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করে আল্‌কেমির নববিশ্ব
ভুঁইফোড় গায়ত্রীর বরে।
ইরার প্রণবছন্দে পুরোডাশে লালায়িত তাপসের সোমরস ঝরে!
যজ্ঞের জ্যামিতি-ছকে আত্মজ্ঞানে আত্মরত
পুরুষের অঙ্গহানি-ফলে
নাভিস্থিত প্রজাপতি স্মিতহাস্যে বারে-বারে
বুঝি-বা দক্ষিণে বামে টলে।
বরুণ ফিরায় মুখ, বারুণীও রোগে ক্ষান্ত, মহামারী হাসে
অনাহারে অনাচারে দস্যু আসে আর্যাবর্তে
বন্যায় ধূসর মর্ত্যে
কুসীদজীবীর শর্তে
অত্যাচারে দুর্ভিক্ষের রক্তাক্ত আকাশে।

তবু বাঁচে দাসদাসী চাষী ও মজুর যত
আশ্চর্য জীবন!

তার পরে বিশ্বসাজে প্রকৃতি, প্রপঞ্চ, ঝুটা,
মায়া, মরীচিকা,
জ্বালাহীন ছলা শুধু, অর্থের অনর্থমাত্র।
সে দায়িত্বহীন
তুরীয় আশ্রমে লোভী শিখা
নেড়ে-নেড়ে ঘাম ঝরে আর ক্ষরে
অবিরাম বিশ্বের শূন্যতা,

দ্বিধান্বিত ঘোরে
দেশে-দেশে তীর্থে-তীর্থে বীতরাগ পরিব্রাজকেরা।
এদিকে চলেছে রাজ্য,
পরিচারিকার ভিড়ে তাম্বুল চামর বয় বণিকেরা,
কেউ বয় স্থূল রাজোদর।
দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা, সসাগরা সাম্রাজ্য ভাণ্ডার
প্রতিদিন হয় ভাজ্য পারিষদ, প্রিয়সখী,
কোটাল, কুটুম, চোর, রাজগুরুদের মাঝে।

তবু বাঁচে দুস্থ ও বর্বর
যারা ছিল দাসদাসী— আর নেই আজ নেই নামহীন
চাষী ও মজুর।
কবে থেকে বেঁচে আছে নামহীন দাসদাসী
কত শতবার
মরিয়া না মরে রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর—
উত্থানে ও পতনে বন্ধুর চূড়ায় প্রতিষ্ঠ আজ বর্শার ফলার মতো
আশ্চর্য জীবন!

রাত্রি গভীর এখানে, তবুও অনুরণনে
তারায়-তারায় ভরেছে আকাশ মন্দ্রভার
মর্মবিহারী সুরের আবেগে পূর্ণ রেখা
অগণন মনে ছবি এঁকে দেয়, জনসভার
আবেগে আমার সত্তার পটে কালের লেখা
বিছায়। আগামী ঘটনায় তুলি জীর্ণ কভার,
প্রাণের পুঁথিতে প্রেমের আলোয় পালায় ছায়া—
শানিত বর্শা পাঁচ পাহাড়ের চূড়ায় দেখা
জনারণ্যের জীবনে দীপ্ত প্রাণের মায়া।

মরণ মানে শরণ যার, হে দূর পূর্ণিমা!
মরণে হানো পূর্ণতার নীলিম তরবারে,

সঙ্গীহীন রাত্রি পায় যেখানে তার সীমা
সেই অগম আঁধারে হানো রুপালি খরতারে—
ভীরু হৃদয়ে ঝলকে ওঠে কৈলাসের দ্যুতি
আত্মহন হিংসা সেথা ভবিষ্যতে মৃত—
সেখানে শুধু মৈত্রী আর ঐক্য ভরে শ্রুতি।

নীলিমা! তুমি নীলকণ্ঠ-উজ্জীবনে বৃত।
একের নীলা অন্যে দাও, তোমার আমার সীমা
প্রতীক হ'ল মরণজয়ী সমাজে, পূর্ণিমা!

১৯৪৫

আমার সমুখে তুমি

স্বপ্নে নয়, নরকের পরে এ রচনা।

দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ়ক্ষতি লুব্ধ অত্যাচার।
জেনেছি অনেক গ্লানি আমাদের বর্তমানে
প্রতিযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে।
শিশুর প্রত্যুষ থেকে আনন্দের কণা
তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে
মেঘে মেঘে কলিজার প্রচণ্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকানো বেগে
স্থর্যে স্থর্যে মুঠি মুঠি দিন
উড়িয়ে সোনালি পাখা সমুদ্রের হাসি পাহাড়ের ঘাড়
হেমন্ত আকাশে
ভাসিয়ে শরৎ ঝর্না ধানে গানে কিশলয়ে কাশে
ক্ষেতের আষাঢ় বন্যা সোনালি ফসলে
গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে ঘরে হাতে হাত খামারের পাশে
ওরা চলে প্রবল গর্বিত সারে শান্তির কাওয়াজে আকাশে পাখির মতো
ওদের পায়ের তালে মাটির আবেগ
ওদের উন্মুক্ত চোখ নীরব সংহত
ওরা চলে সমুদ্রের চালে পাহাড়ের বেগে একমনে
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া দুই দুই কিতারে কিতারে

ওরাই কি ছিঁড়বে দিন একঘেয়ে রাজপথে
এনে দেবে জীবনের সমুদ্র-পর্বত
স্থর্যে স্থর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
নামাবে প্রাণের স্রোত সদ্যধোয়া ঢলে
নতুন ফসলে

কাজের বিরস দিন ক'রে দেবে বৈশাখের মেঘ
রচনার দিন
ঘরমুখো সন্ধ্যাগুলি সূত্রহীন হংসবলাকা
আমাদের ছন্নছাড়া স্বরে স্বচ্ছন্দ প্রচুর
ঘরে ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর স্বর ?

বিবর্ণ দুপুর জ্বলে উদয়শিখরে ঐক্যতানে সূর্য সূর্য অস্তাচলে।

* * *

দেখেছি কেমন মরে তিলে তিলে প্রতিদিন
নির্মম নির্বোধ চক্রান্ত অভ্যাসে
হাজার হাজার মন যে কেমন চক্রবৃদ্ধি অভ্যাসের ঘায়ে
ঘায়ে হয় ছারখার
হাজার হাজার আমি নিজেই দেখেছি ভুগেছিও

নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে
আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার
অমরার দীপ্তি মনে আমিও ধুঁকেছি, যাত্রীর খাতায়
মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কমেডিতে হাজার হাজার দেহের মনের
অপঘাতে অপঘাতে টুকেছি এঁকেছি
নরকের বহু ছবি ছবি আমাদের।

নরকের পরে এ রচনা।
অনেক বছর ধরে অনেক রাজার রাজ্যে গাঁ উজাড় বাজারে বাজারে
জীবন তো সেকালের কড়িকেনা দাস কারো নয় কেউ
আর জীবিকা তো কুবেরে কোটালে ঠগে ঠগে ইদুরে শেয়ালে
দেশে দেশে দৈনন্দিন ইংরেজ মার্কিন যেহোক সেহোক অসহায়
পণ্যস্ত্রীর চেয়েও অধম।

নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড় সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড় নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিনান্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি।

পিছনে নরকযাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি
নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে
হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়
যেন মিলে যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ
দুর্দম প্রাণের বহ্নি জ্বেলে দাও তুমি
আমার এ অন্ধকারে উদ্যত প্রদীপে।
আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ ও ভঙ্গুর
সভ্যতার বহুদূর ঘিরে
আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষে
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রূর মৃত্যুদেশে
সীমান্ত-রেখার আশা, চরম মুহূর্ত শুধু ছাড়পত্র
ছাড়পত্র নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায়
ছাড়পত্র নতুন ভাষায় নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে।
আমার যাত্রার পিছে দীর্ঘ পটভূমি
আমার সমুখে
তুমি।

আগুনে তুষারে নরকের শাদায় কালোয়
ভালো-মন্দ জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণায়
সত্তার সংহতি দিয়ে শরীর মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আতত ছিলায়
একলব্য তীর সেধে সেধে বেঁচে বেঁচে
বেঁচে থেকে থেকে শূন্য তেপান্তরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
দৈত্যের পুরীতে গুপ্ত কঠিন গুহায়
দিন দিন বছর বছর হিংস্রলোভ পলাতক বঞ্চনার নরকের
শেষের টিলায় নিঃসঙ্গ শ্রেণীর আপতিক রৌরব কিনারে
ব্যক্তির বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশায় মানুষের আনন্দের আয়ুষ্মান রেশে

এসেছি যাত্রার শেষে ধনধান্যপুষ্পেভরা
আমাদের এ বসুন্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তির ঝঞ্ঝায় নিঃসঙ্গ উধাও
মানুষের পরম্পরায়, প্রেমে, বন্ধুতায়, কর্মে, রচনায়।
এ দেশ আমারও দেশ, দু হাত মিলাও।

মে-দিন

মে-দিনের গান অক্ষয় প্রাণে
দুর্গত দেশে বঞ্চিত ত্রাণে
তোলে চৈতালী সুর

ওরা ভাবে ঢাকে কালবৈশাখী
মরণভিখারী শ্মশানের পাখি
মশানে পোড়াবে মেঘ

মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে
হে লালকমল হে নীলকমল
নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে
স্বর্ণলঙ্কা চূর্

ওরা কি বাঁধবে সমুদ্রশ্বাস
বৈশাখী মেঘ ঝড়ের বাতাস
রুধ্‌বে বজ্রবেগ ?

মে-দিনের গান কালবৈশাখী
ঝড়ে ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখি
মরণই মরণাতুর

হাজার শকুন ওড়ে পথেঘাটে
মরিয়া ছলায় শত পাখসাটে
ঢাকে নাকি ঝোড়ো মেঘ ?

হে পৃথিবী ! আজ এরা উন্মাদ
তোমার সত্যে বৃথা সাধে বাদ
যুগান্তে ভঙ্গুর

কুটিল ভেবেছে কেউটে কামড়ে
কোটালে শকুনে পাখায় চাপড়ে
রুধ্‌বে বজ্রবেগ !

হে পৃথিবী মাতা ! বিশ্বজননী
দৃঢ় পদে কড়া হাতে দিন গণি
আশ্বাসে ভরপূর

বিশ্ব-মাতার এ উজ্জীবনে
বৃষ্টিতে বাজে রুদ্র গগনে
লক্ষ ঘোড়ার খুর

বিশ্ব-মাতার কোটি সন্তান
দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান
অমোঘ নিরুদ্‌বেগ

কোটি জলকণা এই জনতার
কালবৈশাখী রোখে বলো কার
মেশিনগান বা চেক্ ?

হে পৃথিবী মাতা ! নীল ধারাজলে
বিদ্যুতে বাজে পুড়ে থাক্ জলে
হে লালকমল হে নীলকমল
পোড়া চোখ শত্রুর

দুই হাতে ডাকে স্বাগত স্বাগত
পথে ঘাটে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে শত
উত্থান-বন্ধুর

মিলিত হাতের মে-দিনের মেঘ
তাজিক কাজাক্ রুশ উজবেগ !
হে লালকমল হে নীলকমল
হাজার কসাক্ মেঘ ।

লালতারা

Avanti popolo ! Communisma viva !

জন্মে তোমার উঠেছিল লালতারা,
বাহু তুলেছিল মৃত্তিকা অম্লান,
আকাশে আকাশে উচ্চৈঃশ্রবা হ্রেষা,
কালপুরুষেরা ধরেছিল এক তান।

রুদ্রের হাসি প্রেমের বহ্নি উমার
তোমার বাহুতে মুদ্রায় টলোমলো,
তোমায় জানে না এরা তো কেউ কুমার !
কত রাক্ষসী মায়া না ছড়ায় বলো।

বাধাক্ দাঙ্গা, রাঙাক্ রক্তে মাটি,
গর্দান দিক গাঁয়ে গাঁয়ে ঘাটে হাটে,
শহরে পাহাড়ে বাঁধুক না শত ঘাঁটি
ধূমকেতু যত তারার লালেই কাটে।

আকাশে বাতাসে ঘুরুক গুপ্তচর
তাই কি পক্ষীরাজের থামবে ওড়া ?
মাঠে বাটে ঘোরে বরকন্দাজ শত
তাই থমকাবে তোমার প্রাণের ঘোড়া ?

যুগ যুগ ধরে কালের সাগর সেঁচে
বীরের রক্তে মাতার অশ্রুজলে
জয়যাত্রাকে রুখবে কে ছলে বলে
অন্ধ চোরায় গড়খাই কাদা যেচে ?

শুনেছি বিদেশে মেতে উঠেছিল নদী,
রাজার সেপাই কাদা দিয়ে তাকে রোখে,

ভেঙে ধায় বান, ইতিহাস নিরবধি
টেমসেরই মতো ছুটেছে, কে তাকে রোখে ?

পড়ুক না গুলি, উঠুক না শত কোড়া
বাংলায় গাঁয়ে পাহাড়ে কলকাতায়,
তবুও কুমার ছুটেছে তোমার ঘোড়া
তড়িৎ ট্রামের চেয়েও ত্বরিত পায়ে।

দু চোখে তোমার ধিকিধিকি লালতারা,
উত্তোলবাহু আগুনবাঁধানো মুঠা,
দেশবিদেশের রাক্ষস দিশাহারা
ছুটেছে মরিয়া ইল্লিদিল্লি ঠুঁটা।

বৃথাই ছড়ানো রক্তের লালধারা,
গাঁয়ে ঘাটে হাটে জন্মের লালতারা
জ্বলে যে তোমার পদক্ষেপের ছাটে
দেশে দেশে জ্বলে দুরন্ত পাথসাটে।

খোলে নি খোলে না তোমার ঘোড়ার খুর
প্রাণে ইস্পাতে পিটানো সে অভিযান।
তোমার বাহুতে তাই ভীরু বন্ধুর
দেশে দুর্জয় গরজায় জয়গান।

১৯৪৫

লাল নিশান

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল ?

চোরডাকাতে মুখোস্ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায়।
মরিয়া যত রানীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক-পূজা নরবলিতে জানায়।

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান ॥

এ মৃত্যু মৃত্যুও নয়

(এ মৃত্যু মৃত্যুও নয়, সে-কথা শেখালে তুমি
হে প্রাজ্ঞ লেনিন ! ভুলি নি, চূড়ালা !
অবীচিকর্কশ শুধু পঙ্কক্লেদে ভেসে যায় ডালা
মরণের শূন্যমরু অগ্নিস্রোতে,) নিরানন্দভূমি
নরকের অট্টনাদে আকস্মিকে অমানুষ পরম্পরাহীন

পড়ে থাক্ এ আত্মঘাতীর অনাদ্যন্ত খেয়োখেয়ি
ঘেয়ো কুকুরের মতো অন্ধকারে উচ্চকিত দিন
শুধু স্বর্ণপদলেহী রাজত্বের ভাগবাটোয়ারা শত শিখিধ্বজ
দুঃস্বপ্নগৌরবে কল্পনার ফোয়ারায় বিদেশীর পায়ে দেহি দেহি
স্বদেশের রক্তপঙ্কে নির্লজ্জ রৌরবে ।

চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে
নীলে নীলে মুক্তিস্নানে, বালুকাবেলায়
শিশুর খেলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামরকতে
স্ফটিকে পান্নায় মুহুর্মুহু রঙের খেলায়
হে তন্বী চূড়ালা ! ঊর্মিকলরোলে
জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ সচ্ছল ভেলায়

যেখানে রাত্রিরা স্তব্ধ রাত্রি নীল রাত্রি নীলে কালোয় অসীম
যেখানে দিনেরা দীপ্ত দিন
সূর্যের নয়নে জলে হীরক অম্লান শান্ত শীত জলে
ইন্দ্রনীল আকাশের বিস্তারে বিস্তারে,
বালিয়াড়ি জলে যেথা স্ফটিক প্রভায়,
এমন কি মন্থর কাছিম
সমুদ্রশালিক সেও খাড়ির কিনারে কোনো নির্বাচনহীন
নিজে নিজে ডিম পাড়ে
বালির পাহাড়ে যেথা স্বচ্ছন্দ দম্পতি প্রাণের উৎসবে

পূর্ণরতি চেয়ে থাকে জীবনের আকাশের নীলে
কিংবা নীল সমুদ্রের সমান সুযোগে
মুক্তিস্নাত সামগান উন্মুখর উর্মিল বিপ্লবে
উন্মুক্ত সম্ভোগে।

চলো যাই, হে চূড়ালা ! বঙ্গোপসাগরে
মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে ভারতসাগরে চলো মামল্লপুরমে কোনার্কবন্দরে
কিংবা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কাম্বে কিংবা কচ্ছোপসাগরে
জাভায় বলীতে মার্তাবানে ওদেসায় আস্ত্রাখানে
বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ
একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে
চল্লিশ কোটির প্রাণে দোলে
(দশ কম চল্লিশ কোটির নরকবর্জনে) জীবনের নীলে
সংহত নিখিলে
আসমুদ্র হিমাচল সমতল সমুদ্রের গঙ্গার পদ্মার সিন্ধুর ভল্‌গার
স্বাধীন স্বাধীন জলে জীবনের ঢেউ।

জল দাও

গরমে বিবর্ণ হ'ল গোল্‌মোরের সাবেক জৌলুশ—
কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে ঝরা মরা পোড়া লেবার্নমে
এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগ্‌নি ফুরুষ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে খুঁজে যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া হিংস্র গরমে
এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি চুপি আমাদের পালা
কিম্বা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে থেকে হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ চরম হাঁপায়
জীবনে মৃত্যুতে কিংবা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে কোন্‌ দেশে শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় ছুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধমেরু কিংবা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়

গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কত চেলিউস্‌কিন ! হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়।

হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি রাশি বেলমল্লিকায়
বাগান বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতাঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার-মরার চরম যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি বা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্‌বৃত্ত সত্ত্বেও— বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে।

কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা— না হ'লে বলব তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষায়
আততির আবর্তসেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি
আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রতুক্রতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে নিজে এবং সবাই যদি ধানে মই
দিই নিজে নিজে কিংবা সবাই বেশি বা কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম কারো বেশি

আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোণে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে
আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহমনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়— কিছুটা উদ্‌বৃত্ত সত্ত্বেও
এক পাত্র জল জ'মে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায়।

এবারে উঠেছে হাওয়া ধোঁয়া নেই দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
নাকি কোনো দোলাই দেয় না সে?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে
প্রকৃতি কি অপ্রাকৃত মূঢ়তায়?
হাসবে কি একাই নিষাদ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণচাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে?
তবু সন্ধ্যা চৈত্রসন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাতে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অন্ধ বিসংবাদ
উন্মাদের ব্যবসাও
চূর্ণ করে গৃধ্নু দানবিক হিংস্র কণ্ঠ

হয়তো বা শুনিনিকো হাসি
তোমার পূর্ণিমা! তবু আমি শুধু খুঁজি নি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুনেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা
দেখেছি সবাই যেন ভাসি

তুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, নদী কিংবা
আলোর ঝর্নায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক।

হয়তো বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সত্তার অক্ষরে লিখে লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান
কিংবা যেন ফাল্গুন-চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন
কিংবা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান

কিংবা বুঝি মোহানার গান
হুগলির নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারাণের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের

অথচ নিস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে কারণ সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলন বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুত্থত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল্ ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিংবা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীরে আরালে কিম্বা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে
সাগর-উত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
উর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান
প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য উর্মিল কল্লোলে
পাড় গ'ড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়

বন্যার অজেয় যুদ্ধে কখনো বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনো নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা

আমি দূরে কখনো বা কাছে পালে পালে কখনো বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে

জল দাও আমার শিকড়ে ॥

১৯৪৭

ত্রিপদী

আমি তো যাই নি রঙ্গিলা কারো নায়ে ;
আমি এ মাটিতে, তোমাকে দেখেছি প্রভাতে পিয়াল-ছায়ে
জীবন যেখানে আকাশে জমাট একটি নিকষ পাহাড়।

বহু ব্যর্থতা বহু বেদনার বাহুল্যে বর্বর
প্রাণের পাতাল শহরে জীবন অচল অনড় অসহ,
তার মাঝে তুমি সংকল্পের প্রান্তর-বিস্তার।

যেন বা প্রকৃতি। স্থিতির গতির অনন্ত দ্বন্দ্বের
তোমার বিজয়ী সংগঠনের ঐশ্বর্যের পাশে
আমার গ্রীষ্ম পাক্ শরতের সংগতি।

দিকে দিকে আজ আমারও শারদ জীবনের প্রান্তর,
প্রান্তিক ঊষা চোখ মেলে চায়, একটি নিকষ পাহাড়,
শ্যামলিমা বেয়ে একটি সোনালি নদী।

উপোসীর চোখ মেলাও এখানে কাস্তের কাঁপা সবুজে,
তৃষ্ণার দিশা মিলুক কাঁঠালছায়ায় গভীর ইঁদারায়,
অনাচার হোক দূর স্মৃতি, কাজ প্রত্যহ খোলা মুক্তি।

নদীর বাঁকের চড়াই পাড়ের ছায়ায়
একটি অমর লালকরবীর শাখায় শাখায় ফুল,
সেই ফুলে দাও ত্রিপদী ছন্দে আমার মনের উপমা।

পরিবর্তনে ভয় নেই তুমি পৃথিবীরই মতো উন্মুখ
ক্ষয়ে প্রগতিতে অক্ষয় এক সচ্ছল একতান,
তোমার দু চোখে দেখেছি আমার উত্তর

জীবন যেখানে স্বচ্ছ আকাশ, মানুষেরা সব পাহাড়,
মুক্ত শহরে কেউ-বা সুস্থ গাঁয়ে ॥

অক্টোবর দিনগুলি

তুমি কি আসবে ? আসবে কি তুমি
ধুয়ে বনভূমি পাঁচ পাহাড়ের
মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নীলাম্বরীর
আঁচল ছড়িয়ে নদীর পাড়ের
গেরিতে মেলাবে স্বচ্ছ শরীর ?
ভাসবে এলা-য় আউষের ক্ষেত ?
হাজার জমির সীমানা সমেত
আল্ ভেঙে ভেঙে। আমনের পাকা
হাল্কা আলোয় হাসবে কি তুমি ?

আমার দিনগুলি হাজার ঢেউ,
গ্রামে গ্রামান্তরে শহরে যায়,
কখনো মেঘে মুড়ি চেনে না কেউ,
কখনো রৌদ্রের প্রবলতায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে সমুদ্র গড়ি,
সোনাখচা বনে লোকালয়,
প্রকৃতিতে গড়ি সমাজের বরাভয়।

উর্মিল কর্মের দিন উড়ে চলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
এ আকাশে বাসা তার জীবনের সমুদ্রে উদার।
বাস্তবের স্বপ্নের ভিড়ে তাই মিলে যায়।

সুদূর বন্ধু, বিশ্ব মিলালে হাতে,
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে,
তোমার বীরের প্রত্যয়ে হোক্ মুকুলিত প্রত্যাশা !

লালের কত না কাজ, জবা ও গোলাপ
এ আকাশে দীন অপলাপ।
এদিকে তুষার-রাশি যন্ত্রণায় শুভ্রকেশ
মেঘ হয়ে ওড়ে
ওদিকে পাহাড় আর কালো মেঘ মাতে মন্ত্রণায়।
কোথাও বা ইন্দ্রনীল
কোথাও বা স্ফটিক আকাশে লাগে
আমনের পান্নার আবেশ।

আমরা মানুষ তবু চাতকের মতো ঊর্ধ্বমুখ,
মাটির মানুষ তবু চোখ-কান আকাশবিহারী,
আমরা মানুষ তবু মেঘ-রৌদ্রে বাঁধা দুঃখ-সুখ।

কোথায় কোথায় গেল আশ্বিনের পূবালী বাতাস!
জলেস্থলে এনে দাও কর্তৃত্ব অপার।
লাখো হাতে ইন্দ্রধনু ভেঙে গড়ি আকাশ-পৃথিবী।

সবুজে বেঁধেছি দুই চোখে আজ ধুয়া
রসালো সবুজ কাঁচা ক্ষেত, আঁকাবাঁকা
খোদাই সবুজ মাঝে মাঝে ঠায় তমাল বা শাল মহুয়া

কোথাও বা দেখি সবুজ আমনে লেগেছে সোনার আভা
নীলে আর লালে গেরিতে এলা-য় সবুজ কি গান করে
শতেক গন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় মেলায়।

গোলাপ আর তো ঝরে না সান্ধ্য ক্লান্তিতে
আমার আশার শিশিরে শিশিরে শান্ত,
তোমাতেই তার উদয়-অস্ত হৃদয়ের লাল-কলাপ।

অশেষ বাহার ! শরতের মাঠে কত বিচিত্র ফুল,
রঙের বাহার ! এক সুযোগের হাজার আকার ফুল !
তুমি চলো লঘু তন্বীর পদপাতে।

তবু নামে অন্ধকার।
এক ঝাঁক টিয়া গেল, কৈলাসের আবেগবিধুর
চলে গেল শব্দময়ী অপ্সর রমণী
বলাকার শুভ্র পক্ষধ্বনি,
একে একে গগনভেড়ের সাঙ্গ হল অভিযান।
অন্ধকার বনে ডোবে তিতিরের গান,
চলে গেল নিঃশব্দ বাদুড়।

এ সন্ধ্যায় আকাশ পালায়
বিষণ্ণ গ্রামের সন্ধ্যা অভাবে মলিন
শহরে উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধ্যা ক্ষতে ক্ষতে লীন
উদ্দাম যুবার রোগ যেন।
এ আকাশ ধুয়ে দাও স্বাধীন সন্ধ্যায়।

গ্রামীণ এদেশ শহরে শহরে শুধু গ্রামভাঙা বস্তি,
আর গ্রামহানা শহরের শেষ কবন্ধ চির আকালে।
বিদেশী ভাষায় শুনেছি লোভের শাসনে চিরটাকাল
শ্বেত হস্তীর নিত্যশোষণ, প্রতিদিনই তার মস্তি।

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
জীবনের মূক ত্রস্ত আঁধারে ভাষা,
তুমিই আমার জীবনের বিশ্বাস।

গোলাপ আর তো খোঁজে না প্রভাতী উষাকে
দিনরাত্রির প্রগল্‌ভতায় অচঞ্চল
তোমাতেই স্থির সম্বাদী নিঃশ্বাস।

নেমে এল একাকার গোধূলির পটে বর্ণহারা
স্বচ্ছ অন্ধকার, একটি তারকা ভালে,
জীবন মৃত্যুর নীল শূন্যে অগ্রদূত,
সকালের শুকতারা, লালতারা আসন্ন সন্ধ্যার।

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, তার
সোনার কবরীখসা একটি কুসুমে
তোমায় সাজাব কবে সম্পূর্ণ দিনের শেষে প্রিয়া
পরিচ্ছন্ন ঘুমে।

পৃথিবীর গান শত মুখে মুখে উন্মুখর,
মাটির শিকড়ে গন্ধের শত মূর্ছনা
ঘ্রাণে ঘ্রাণে এ কী অর্কেস্ট্রায় বুক ভ'রে দেয় দিনরাত!

কখনো তীক্ষ্ণ ভিয়োলা সবুজ ধানে,
কখনো বেয়ালা পাকাধানে বাজে তীব্র মুক্ত ছন্দে,
ঘাসের চেলোয় মেলায় দোটানা মন্দ্রে,

ফুলের তেরোটি মুরজ মুরলী থেকে থেকে পশে মর্মে,
তারই মাঝে মাঝে এক পশলার মৃদঙ্গ বাজে হাওয়ায়,
আমাদেরও সব ডাক দিয়ে যায় পৃথিবী ঐকতানে।

দু হাতে হৃদয়ে ম্যাগনোলিয়াকে রাখো,
ছিন্ন হৃদয়ে হৃদয়ে পৃথিবী একটি যে হাহাকার,
দু হাত তোমার রক্ত গোলাপে ঢাকো।

শহরে শহরে কোনোই আরাম নেই,
গ্রামে মানুষের একটুকু দাম নেই।
কঠিন জীবন! তবুও প্রকৃতি তাকিয়ে প্রতীক্ষায়,
তাই তো আমরা মিলেছি এ দীক্ষায়।

মধ্যনীলে একরাশ মেঘ
এখনো ভাস্বর, আপন আবেগবাষ্পে সংহত বিদ্যুতে
আমৃত্যু অম্লান, তোলপাড় সূর্যবহ মরীয়া সম্বিতে।

দিগন্তে দিগন্তে দূর জীবনমৃত্যুর পারে পারে
ও কি পাহাড় চেয়েছে মেঘ হতে ?
জানি আচম্বিতে হ'ল মেঘ-ই পাহাড়
আরেক নির্মাণে ?

হাওয়া চলে গেল পুব থেকে পশ্চিম
ফসলপাকানো সাঁঝ-সকালের হিম,
ঢোল থেমে যায়, ঢেঁকিশালে পড়ে তাল,
সর্ষের ক্ষেতে ঠিকরায় আলো, গলিতে শিহরে নিম।

টিলার ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাঠের মরকতে
কুল্‌থি-ক্ষেতে আর হঠাৎ লালে লালে
চোখের চলা চলে রঙিন পথে আলে
মনের স্থর খোঁজা জীবনে জনে জনে
দুস্থ কুটিরের শুকনো ফুটো চালে
দুঃখী শহরের বেস্থর গতে গতে
এই যে নীলা এই স্ফটিক ক্ষণে ক্ষণে
শিশির সজলতা হাওয়ায় আশা ঢালে
এতেই জীবনের স্বপ্ন গুঞ্জনে
উদার সংগীতে মেলায় একমতে ॥

ক্লান্তি নেই

আমার স্বপ্নও অপরিসীম
আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই,
অথচ ডালে ডালে শুকনো হাহাকার,
অথচ মাঠে মাঠে অসাড় হিম,
আকাশে কান্নারও ক্ষান্তি নেই !

জীবন উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায়,
প্রতীক্ষা, না এক মিশ্র সুর !
আকাঙ্ক্ষার নীলে রেঙেছে অঙ্গার,
চাওয়ায় পাওয়া মেশে সে ভিক্ষায়,
শরীরে মন মেলে মুঠিতে দূর।

চাই না তুমি বিনা শান্তি-ও,
তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই।
কৃষ্ণচূড়া রাঙে, সেও তো হাহাকার ?
আমারই হৃদয়ের কান্তি ও।
তোমাকে জেনেছে যে শান্তি নেই
জীবনে তার আর, সেই হীরার ॥

স্টালিনগ্রাদে মে-দিন

ডুবেছে তখন চৈত্রজ্বালা অগ্নিদিন
দক্ষিণ বাতাসে স্নিগ্ধ মোলায়েম রাত বয়ে যায়
ভিন্ন হয়ে যায় এক
ধুলা আর ধোঁয়া -স্নাত মহাশ্বেতা জ্যোৎস্নার তীব্র মাধুরীতে
আমাদের জীবনের বিভীষিকা জঘন্য প্রত্যহ,
নির্মম কুটিল ঘৃণ্য অমাবস্যা হয়ে যায়
সহনীয় এমন কি মধুর বুঝি-বা পূর্ণিমায়
মনে হয় জ্যোৎস্না বুঝি এসে গেছে পরাজিত দিনে
জ্বালা বুঝি বিজয়ীর শান্তি
বুঝি এক হয়ে গেছে সব ভিন্ন
জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ঘৃণ্যের রাজত্ব শেষে সমুদ্রের স্বপ্নালু বাতাসে প্রাণের দিনের
আমার প্রেমের মতো
হাতে হাতে মৃত্যুহীন হৃদয়ের আগুনে ইস্পাতে
যেন এক জন্মদিন প্রতিদিন।

হঠাৎ বেয়ালা বাজে
সুরের আনন্দে মাতোয়ারা বিষাদে গভীর
শুনেছি কয়েকদিন মাঝে মাঝে সুরের পাগল এক
গৃহহীন কিংবা ঘরছাড়া হয়তো-বা ভিক্ষাজীবী, যে যা দেয়,
থেকে থেকে সন্ধ্যায় রাত্রিতে এপাড়া ওপাড়া
গলিতে গলিতে কখনো-বা চৌমাথায়
খুলে দেয় সুরের ফোয়ারা জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে
স্বপ্নের বিদ্যুৎ-ঘর
ধুয়ে দেয় দিনের ঘৃণ্যতা
নির্বোধ লোভের গ্লানি অনর্থক স্বার্থের দহন
গেঁথে দেয় আসন্ন নির্দেশে অধরা আবেগে কানে কানে
শিল্পের চরম রসায়ন
সংঘটিত বিরোধের রূপকার স্রোত, সুরের সংহতি।

বেয়ালায় সুর চলে স্নিগ্ধ মৃদু দক্ষিণ বাতাসে
মেলামেশা নির্বিরোধ স্বাধীন আকাশে
আঢুল বাড়িতে আর ঘুমন্ত বাসায়
যন্ত্রণার নিদ্রাহীন ঘরে বস্তিতে বস্তির
পাশের প্রাসাদে নীরক্তের পারদ-আলোয়
অভাবের অসুখের ঘরে রাস্তায় রাস্তায়
অপরাজেয়ের প্রাণ বেয়ে আসা প্রকাশ্যে গোপনে
বিশ্বপ্লাবী সুর

মনে হয় এই সুরে চাওয়া যায়
পাওয়া যায় যাওয়া যায় দক্ষিণ বাতাসে
যাওয়া যায় বাংলার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে
বহুদূর বাংলার এই জ্যোৎস্নায়
যাওয়া যায় ইয়াংচির ঘাটে ঘাটে
হানের রক্তিম স্রোতে পাহাড়ে পাহাড়ে
তুন্দ্রায় তাইগায় স্টেপে স্টেপে প্রান্তরে আবাদে
এই সুরে গেয়েছিল পেয়েছিল কত প্রাণ কত দেশ
কত গান কত না শহর
এই সুরে জারিৎসিন জীর্ণ সেই বর্জিত কবর
প্রাণ পেয়েছিল কবে স্বপ্নে যেন
দিনে দিনে সুরে গাঁথা স্বপ্নালু স্টালিনগ্রাদে
প্রাণের স্বপ্নের
এই সুরে যন্ত্রণার মোচড়ে মোচড়ে ব্যথার ঝঙ্কায়
অব্যর্থ আশার তীব্র মূর্ছনায় মূর্ছনায়
দিনীপারে স্রোতে স্রোতে অমর সুরের স্রোতে
আকাশে বাতাসে হেনে করকায় করকায় জ্যোৎস্নার
অজেয় আনন্দ
বীর্যের প্রশান্ত ছন্দ মানুষের
স্টালিনগ্রাদের মানুষের।

আবার আলাপ ভাসে দুর্জয় বেয়ালা
প্রাণের অক্লান্ত উৎস, বিষাদের অভিজ্ঞ পুলকে
যন্ত্রণার হর্ষে হর্ষে রোমাঞ্চিত গ্রীষ্মের ফুলের মতো
চৈতন্যে প্রেমের মতো
মুঠি মুঠি বৃষ্টি করে স্বর জ্যোৎস্নায় হাওয়ায়
কম্পমান অথচ সুঠাম অস্থির অথচ অটল
প্রবাহ অথচ এক,
ভিন্ন হয়ে যায় এক, সমান বন্ধুর।
প্রত্যহ আয়ত্তে আসে বাস্তব মেশায়
স্বরের সংগতে সাধ্য পরিবর্তনীয়ে
আমরাই হয়ে যাই স্বর।

গৃহহীন— অজানা— হয়তো ভিক্ষাজীবী তবুও অজেয়
বেয়ালার তীব্র কণ্ঠে খাদে নিখাদের
মনে হয় হাজার বেয়ালা লাখো লাখো লোক এদেশ ওদেশ
অথচ একাগ্র বাঁধা গান্ধারে গান্ধারে
মনে হয় আকাশের বাতাসের জ্যোৎস্নার এ দিনের
বাংলার স্থবির প্রাণের স্বরে মিশে যায় শান্ত অতিক্রান্ত
দিনীপারে দানিয়ুবে মেশে যেন স্টালিনগ্রাদের
শান্তিময় মে-দিনের ফুলে ফুলে স্বরে স্বরে উত্তীর্ণ আথরে
তোমার ঘুমের পাশে আমার প্রেমের মতো নির্নিমেষ
প্রেমে প্রেমে নীলাকাশ জন্মদিনে আমাদের
জন্মদিন প্রতিদিন স্টালিনের মৃত্যুহীন প্রতিদিন লেনিনের।

আত্মীয় সওগাত

মহেন্‌জোদাড়োর পণ্যে ছিল কি তোমার বেচা কেনা
মাইকপের মাটিতে পাথরে ?
জেঙ্গিস্ খানের ঘোড়া ছুটিছিল তোমারও প্রান্তরে,
তৈমুরলঙ্গ কি ছিল চেনা ?
কিয়েফে কাঁসর ঘণ্টা বেজেছিল সন্ধ্যারতিকালে
দ্বাদশমন্দিরে যেন বাজে,
পামীরের পরপারে সমরকন্দ্‌, ফের্‌গানা রুমালে
হাফিজ পাঠালে বোখারা যে।

তবু সে সম্বন্ধ দূর, জ্ঞাতি কিংবা কুটুম্বসমান ;
লেবেদেফ আসে নি তখনো,
বাংলার কলকাতার রঙ্গমঞ্চে ওঠেনিকো গান
জমেনিকো নবনাট্য কোনো।
নেভার অজেয় তীরে লেনিনের আগামী শহরে
কালিদাস পেল তো সম্মান
নতুন অমরকোষে দেবভাষা রুশ কণ্ঠস্বরে
বিজ্ঞানের পেয়েছে সন্ধান।

তবু সে আদিম স্মৃতি, তখনো তো সরিকে সরিকে
ভুলে যেত রক্তের বন্ধন,
আত্মীয়ে আত্মীয়ে হেনে কুবেরের প্রাসাদ চৌদিকে
গড়ে দিত মনুর নন্দন।
তারপর নির্বাসনে প্রজ্ঞার ত্রিনেত্র নির্নিমেষ
জেলে দিলে যুগান্ত আহবে,
জাগল একটি দেশ তারপরে জাগে কত দেশ
পৃথিবীর কুমারসম্ভবে।

চিদম্বরে সে কি নৃত্য জীবনমৃত্যুতে দুলে দুলে
মাতে যজ্ঞে বিশ্বজনগণ
কালিন্দীর কলরোলে কালের কল্লোলে ফুলে ফুলে
তারপরে কালীয়দমন।
মথুরা বা দ্বারকা বা অযোধ্যাই কিংবা বৃন্দাবন
আজ যদি দুঃস্থের সন্ধ্যাতে
একজ অমৃতপুত্র সহোদর আত্মীয়-পালন
করে, তবে এই সওগাতে

আমরা যে প্রাণ পাব মেটাব যে বুভুক্ষুর ক্ষুধা।
কখনো ভুলি কি সেই দিন ?
তোমাদের আমাদের লেনিনের অনন্য বসুধা
অগ্রজ তো একই সে স্টালিন।
তোমরা যে হাত মেলে দাও দুস্থ বিশ্বের বিপাকে,
আমাদেরও রাত্রে জ্বালো দিন।
তার আভা আমাদের ক্লান্ত পথে আঁকে
কত নব ভেরেশচাগিন ॥

উপোসী পাহাড়ের চড়াই পার

উপোসী পাহাড়ের চড়াই পার
এসেছি আজ এই উপত্যকায়,
পথের লড়ায়ের খদের শেষে
ঘর কি বেঁধে দিলে নীল ছায়ায় ?

এখানে গাছে গাছে সরস প্রাণ,
এখানে ঘরে ঘরে সরল গান,
এখানে মানুষের সহজ মান—
এলে কি জীবনের উপত্যকায় ?

ভিখারী দিনগুলি হয়েছি পার,
হাওয়ায় পার নীল সমুদ্রের,
আকাল রাতগুলি করেছি শেষ,
মেঘের রাতগুলি, যে রৌদ্রের
শরৎ-উষা দিয়ে করেছি জয়
সে রৌদ্রে তো নেই মরুর ভয়,
সে আশ্বিনে নেই বানের ক্ষয়
আমরা সচ্ছল উপত্যকায়।

পাহাড় বাঁয়ে জাগে স্থপতি আকাশের
মেঘ ও রৌদ্রের প্রেমের আভাসের
সতেজ মুক্তির ব্যাপ্ত বাতাসের
গানের নদীপাড়ে উপত্যকায়
হাসির আলো ঝরে এই যে দেশ—
কবিতা আমাদেরই স্বদেশ এই
উপোসী পাহাড়ের খাড়াই পার
ভিখারী দিনগুলি যেখানে শেষ
সবুজ শান্তির উপত্যকায় ॥

প্রখর শান্তি খর উজ্জ্বল

প্রখর শান্তি খর উজ্জ্বল,
কাতর রাত্রি নয় রৌদ্র!
হাওয়া যেন ঝক্‌মকে তলোয়ার!
রৌদ্রে প্রসাদ হানে শান্তি,
শুকনো গেরির মাঠ, লাল ঢল,
রৌদ্রে বাঁধের জল ঝল্‌সায়,

সকালের হিমানীর আর্দ্র
চাহনিতে ছোটে আলো সওয়ার—
তাতার বা কসাকের ভ্রান্তি!
খরবেগ রৌদ্র যা উজ্জ্বল,
আকাশে যা স্বচ্ছতা বাতাসের
লক্ষ লক্ষ হাতে তলোয়ার,
যেন বা প্যারেড কোনো উৎসব!

শান্তি যে চাই খর শান্তি,
রৌদ্রের শান্তি যা উজ্জ্বল,
আঢূল্ রাত্রি নয়, রৌদ্র,
সর্ষে সবৃজিক্ষেতে অড়রে
যে হীরার প্রবলতা ঠিকরে
আখের বনের ঘন সবুজে
হল্‌দি চড়ায়ে নীল শিখরে
গ্রামে গ্রামে আর দূর শহরে

গোলাভরা সোনাজলা আকাশের
পূর্ণের মশালের সে যে দূত,
হীরার শান্তি! সে যে উজ্জ্বল,

সকালের গোলাপের কান্তি
তোমারই লাবণ্য যে বিতরে
বাহুডোরে আতপ্ত ঝলমল,
উদার অথচ খর বাতাসের
রৌদ্রে স্বচ্ছ, ধীর, প্রস্তুত
চাঁদিনীর ইস্পাতে শান্তি ॥

কালের রাখাল শিশু

তোমাকেই দেখি আমি,
নিত্য দেখি, শুনি প্রত্যহের বিকাশে খেলায়
দেখায় শেখায় একাকার তোমার বিভোল নৃত্য,
তারস্বরে গান, কান্নার বৈশাখী
আর আশ্বিনের হাসি, কাকলিকথার ঝরনা।

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আবিষ্কারে নূতন তোমার,
প্রতিদিন বিশ্বজয় খেলায় সক্রিয়জ্ঞানে, হে বালকবীর।
দূর থেকে শুনি তোমার আমার ভেদ, স্মৃতির সাযুজ্যে ভুলি
চতুর প্রৌঢ়ত্ব আর চপল প্রজ্ঞার মধ্যে
দুস্তর বছর—
কাল যেন মহানদী সাঁতরায় উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির—

কিংবা যেন বনের কিনারে কাঠের কাটরায়
জ্বালানির তক্তা সব, আমরা, প্রৌঢ়েরা,
বাল্যের প্রান্তর পারে যারা,
আর তুমি, তুমি বাছা সরস সতেজ কচি
শ্রাবণের সদ্য বট— শাল বা পিয়াল।

তুমি মুক্ত, প্রাণময়, নিঃসংশয়, কর্তৃত্বের অধিকার শুধুই খেলায়,
তোমার ইন্দ্রিয় আর মানস নির্দ্বন্দ্ব,
বাধাবন্ধহারা তোমার বিচার আর কল্পনার
স্বচ্ছন্দ-বিহার এহাতে ওহাতে যেন নির্মাণে মেলায়
তোমার বাস্তব সারা বিশ্বে, চোখ কান ঘ্রাণে এক
চর্ব্যচোষ্যে ধ্যান-ধারণায় সচল কর্মঠ বিশ্ব।

তাই সম্ভবে ও অসম্ভবে নামে
তোমার সমান পদক্ষেপ,

ব্যক্তি আর সমাজের দক্ষিণে ও বামে
তোমার অভ্রান্ত ছন্দ,
দুহাতে ও আশেপাশে ছড়ানো খেলেনা
আর বর্ণমালা ধারাপাত।

তুমিই কি কালের রাখাল
মহাস্থানে বিশ্বের প্রান্তরে
মানুষের পায়ে পায়ে পথের ধারের বটের ছায়ায় ?

আমরাও এপার ওপার সেতু বাঁধি, বাঁশি শুনি
স্মৃতি দিয়ে, আমাদের মানবিক একাত্মবোধের
দ্বন্দ্বময় রোমন্থ-স্মৃতিতে সুর শুনি সাযুজ্যের,
দেখি তুমি নিরাসক্ত আকাঙ্ক্ষায়
মেলাও ত্রিকাল প্রত্যক্ষের একটি কলিতে,
সঞ্চয়ী কারবারে নয়, ঐতিহ্যের নিত্যনব সাক্ষাৎ নির্মাণে।

তোমার অতীত আর ভবিষ্যৎ বর্তমানে অবিছিন্ন
অথচ মুহূর্ত প্রতি মুহূর্তেই অতিক্রান্ত
কখনো জোয়ার আর কখনো বা বন্যাবেগে
আপন বিকাশে আর মুহুর্মুহু বিশ্বপরিচয়ে
নৈর্ব্যক্তিক খেলার বিজ্ঞানে কল্পনায় রচনায়
তোমার অখণ্ড সত্তা বিপ্লবচঞ্চল এবং সংহত।

শোনো শিশু শোনো
মিলাও প্রসাদ তার অসত্যে ভঙ্গুর স্থাবরের এই পাড়ে

— না না, তুমি দূরে থাকো, আমাদের ক্লান্ত কাল
অতিক্রান্ত ক'রে যাও আমাদের ডাক দিয়ে,
চলে যাও পাহাড়ের পরপারে
ঐ সচ্ছল সংহত দেশে যেখানে জ্বালানি নয় মানুষ বন্ধকী নয়

যেখানে পিয়াল শাল বট বা আমের চারা
বর্ষে বর্ষে বনস্পতি, কোনো
প্রাজ্ঞ, প্রৌঢ় ও গম্ভীর, দিউগাশভিলির মতো,
ছায়াময়, হাওয়ায় হাওয়ায় প্রসন্ন, সম্পূর্ণ শাখায় পল্লবে
ফুলে ফলে দীপ্ত, দান্ত ॥

২৯শে নভেম্বর

১

আজ সে আসবে পথে প্রকাশ্যের বিজয়-তোরণে,
হৃদয়স্পন্দন আজ অতিকায় হাজার মাইকে
গোপন প্রেমের মৃদু দীর্ঘশ্বাস আজ বিস্ফোরণে
আসমুদ্র হিমালয় ঢেকে দেবে নূতন স্ট্রাইকে
মজুর মালিক যাতে বাহুবদ্ধ মিটিঙে মিছিলে,
বিরোধীর কণ্ঠ রুদ্ধ বন্ধুত্বের মহাসামুদ্রিকে,
লালদীঘির ধূসরিমা ধুয়ে যায় পথে ঘাটে ঝিলে,
লাল তারা জলে আজ সর্বত্র দেশের দশ দিকে !
আজ সে আসবে, আজ রেখে যাবে বিরাট ইঙ্গিত,
ভবিষ্যৎ রেখে যাবে কোটি কোটি হৃদয়ের মিলে,
সে আসে যে দেশ থেকে, সে ভূস্বর্গে জীবনের ভিত
আরেক পত্তনে পাকা, মানবিক প্রেমের নিখিলে
সেখানে মানুষ ন্যায়ে স্বাধীন ও নির্ভয় মানুষ।
সেখানে উত্তরে তাই দক্ষিণের ফুলফল ফলে,
মরুভূমি গায় আহা বাংলার আষাঢ়ের জলে।
সে দেশের হাওয়া আজ এনে দেবে রুশের পৌরুষ ॥

২

আমাদের চিত্ত জিনে এরা গেল দিগ্‌বিজয়ী বীর—
কুরুক্ষেত্র ভেঙে দিয়ে, অভিনব অশ্বমেধ ! আবেগে অস্থির
আমাদের কোটি কোটি পাণ্ডবের একাত্ম হৃদয়ে
পার্থ পার্থসখা যেন পাঞ্চজন্যে গাণ্ডীবে বিজয়ে ॥

আমাদেরই স্বপ্ন এরা বাস্তবের মর্ত্যে প্রাণময়।
অক্ষত অক্ষয় রাখো স্বপ্নগুলি, সতর্ক, তন্ময় ॥

সূরজমুখীর প্রাণ

সূর্য তখন পড়ে গেছে পশ্চিমে—
ওরা কারা করে মৃত্যুর মিহি গান :
বন্দিনী কোন্ সুন্দরী মৃত হিমে
নিথর— করুণ সুরে কারা করে গান!

কয়লাখনিতে সে কান্না ছায়া বাঁধে,
মায়াবী আকাশে স্তব্ধ বাতাসে গান
বলে যায়, সহমরণের মহাসাধে
তাই কি বিশ্ব বিষণ্ন ম্রিয়মান ?

বিষাদে বিধুর আবেশে তীব্র বোলে
গ্রামের কাতর রাত্রির ঘরে ফিরি,
কানে আসে ও কি গ্রাম্য নাচের ঢোলে
আমনের খুশি চাষীদের দেশী গান ?

ও কি গান শুনি ? নাগ্ড়া মাদল ঝাঁঝে
কত কন্যাকে জীয়ায় সোনার কাঠি ?
প্রাণ পায় ভোরে মরেছিল যারা সাঁঝে ?
আমি বসে যাই এই পাঠে সহপাঠী।

ভোরে প্রাণ পায়, পুবের পাহাড় জাগে,
পশ্চিমে টিলা কুমারীর স্মিতরাগে
চোখ মেলে, রাঙা নদী চলে ঝিরিঝিরি!
এনে দিলে বীর নির্ভয় কোন আসান্ ?
ফিরে এল বুঝি সূরজমুখীর প্রাণ ?
আসানসোলের উষার হাসিতে ফিরি ॥

৮।১২।৫৫

অবর্তমানের দিকে

সত্যই, জীবনে দুঃখ প্রচুর প্রবল,
দুঃখ ঘরে ঘরে।
অভাব ও আতিশয্য দুই উচ্ছৃঙ্খল
দস্যু নানা স্তরে।

অভাব ও আতিশয্য ব্যক্তিতে ও দেশে
হৃদয়ে শরীরে।
তবু ভাবি অনন্য এ জীবনের শেষে
অন্ধকার তীরে
—যেখানে নদী বা ঘাট গ্রাম বা শহর
কিছু নেই, খালি
শূন্য, শূন্য অহরহ নিস্তব্ধ প্রহর,
শুধু এক ফালি
অর্থহীন সময়ের অমোঘ নিয়মে
জীবনের ছেদ,—
আমি নেই, জীবনের দুঃখের সে সমে
নেই হর্ষ খেদ।

তাই ভাবি জীবনের দুঃখ-সুখ থাক্—
যতদিন থাকি।
তারপরে যবে হব নিশ্চল নির্বাক্
থেকে যাবে বাকি
সমস্ত দেশের আর বিশ্বের জীবন।
আরেক অভাবে
মানুষের দুঃখ-সুখ পাবে উত্তরণ
আপন স্বভাবে।
কারণ জীবনে শুধু মৃত্যু বাদ সাধে
মানুষ তা জানে,

আর সব অবান্তর, অন্ধ লোভে বাঁধে
মানুষ অজ্ঞানে।

তাই শেষ দিনে— আসে আসুক যেদিন,
ফেলি দীর্ঘশ্বাস
অবর্তমানের দিকে, যখন সে-দিন
প্রত্যহ প্রকাশ।

বরিস্ পাস্তেরনাক-কে

প্রকৃতিতে মুগ্ধ হও, কারণ প্রকৃতি মনোলোভা,
ভোগ্যা শুধু, উপভোগ্যা, পরকীয়া ; ভিন্ন, বাহির, সুদূর ;
অসম্বন্ধ ; মানবিক সামাজিক নয়। তাই নিসর্গের শোভা
দেখ, শোনো, মুগ্ধ হও, যেমনটি হত ডন যুয়ানেরা
নারীর বিচ্ছিন্ন সঙ্গে, যেহেতু সে সাময়িক বিস্মৃতি মধুর।

এমন-কি প্রকৃতির নিয়মনিষেধ— তাও সহজেই ভোলা যায়,
দূর থেকে, সূর্যাস্তের মেঘে তাই বন্যার ক্রন্দন ভোলো
অসংলগ্ন মুহূর্ত-সম্ভোগে, অন্তরঙ্গ প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ নয়।
অরণ্যের শ্যামলিমা কিংবা শুভ্র তুষার মহিমা
তার মনে কখনো কি প্রান্তরের বাস্তহারা দাবদাহ জ্বালে ?
বাঘের আগুনে ক্ষিপ্র খুশি লাগে, আবার তাকাও অন্য দিকে
হরিণের নাচ দেখ, অথচ হরিণ বাঘের শিকার।
মানুষ হরিণ নয়, বাঘও নয়, ভাবাটাই কবিত্বের চূড়ান্ত বিকার।

কি ক'রে মেলাবে বলো দায়িত্বহীনের ব্যক্তি সভ্যতার লুপ্ত দায়ভাগে ?
বলো কোন লোভী ভোগী স্বার্থের আড়ালে
মানুষ নিসর্গ হবে, ফলফুল গাছ মাটি নদী বন
সমুদ্র পাহাড় সবকিছু হয়ে যাবে নিঃসঙ্গ মানুষ ?

অথচ এ প্রেমের তাড়না বাস্তবিক, খাঁটি বটে।
প্রেমিক কি চায় না প্রিয়ার স্বরূপে মেলাতে
নিজেরই স্বতন্ত্র সত্তা ? যদিও মিললে আর নারী ও পুরুষ
থাকবে না, লুপ্ত হবে প্রেমিক ও প্রিয়া। চিরন্তন প্রেমের সংকটে
পেশাদার প্রেমে প্রেমে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে প্রেম-ই স্বয়ং।
অবশ্য প্রেমের ব্রতে প্রেমের খেলাতে
ভুলচুক স্বাভাবিক, বেসুরে বেতালে আকস্মিকে
নদীই বাঁকতে পারে, শুকাতেও ! ভল্‌গার, গঙ্গার, ইয়াংৎসির,

টেম্‌সের, টেনেসিরও। কিন্তু তাই ব'লে কেউ
চাইবে না পরস্পর দুইপাড়, চাইবে না পরম্পরা পাড়ে পাড়ে ঢেউ ?
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে—
সুতরাং এ জীবনই ত্যাজ্য বলো কবিত্বের ফেউ ধ'রে ?

এ আত্মবঞ্চনা, বন্ধু।
জাতিস্মর বার্ধক্যের সতী নয়, পার্বতীর আজ স্বয়ংবর,
বৃথা খোঁজো শতচ্ছিন্ন সতীর প্রতীক, কিরাত শংকর তাকে
প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত করে, সমাজে যে দগ্ধ আজ আসরের বৈঠকের দক্ষ পঞ্চশর।

ভাবতে অবাক লাগে, এত দেখে এত ঠেকে শিখে
কেন যে অনেকে আজও পশ্চিমার দু-তিন শতকে ভাবি
সভ্যতার আদি আর শেষ ! কবন্ধের লোভে দেহমনে আত্মপরে
একক-অনেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন করি শূন্যে স্বয়ম্ভর।
এ নাটে কুমার কোথা ? এতে নেই অর্ধনারীশ্বর।

এ নন্দনসর্বস্বতা অসম্বন্ধ অন্ধতাই, এতে নেই পূর্বাপর,
পৃথিবীর মানদণ্ড, এ দ্বৈতে অদ্বৈত নেই, এ একে আরেক নেই,
একচক্ষু গবাক্ষে তো মনের আকাশ নেই, বিকাশ বিলাসে রুগ্‌ণ,
বিলাস বিকারে। একলষেঁড়ের এ খোঁয়াড়ে কোথা কারো চাবি ?
আত্মহা এ তত্ত্বের ছলায় শিল্প শুধু পথে পথে খেউড়, প্রলাপ,
প্রকৃতি-মানুষে আর মানুষে মানুষে ভেদ অবশ্যসম্ভাবী।
কুৎসিতের স্থিতাবস্থা চেয়ে কান্না শিল্পে মহাপাপ,
মনের যা অগোচর নেই ॥

২০।১১।৫৮

মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে

"আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি।" ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল। কিন্তু শতসহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন, "আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি।"—রবীন্দ্রনাথ

শোচনা নেই, তাই তো আজও পৌত্র প্রপৌত্র
হবার সাধ আমারও আছে, কৌতূহল অসীম
এবং আশা অমর, তাই তাকাই সেইকালে,
যদিও আজ দিনের বাঁচা নিয়েই হিমশিম,
তবুও ভাবি আজের গিট কালকে কোন সূত্র
খুলবে, ভেবে প্রবীণ গান জমাই চৌতালে।

এটাও ঠিক, যাঁরা সদাই পিতামহের কালে
বাসা বাঁধেন, তাঁদের দলে আমার নেই ইয়ার,
যদিও প্রায়ই আমারও মন পিতামহের যুগে
অথবা তারও অনেক আগে বাংলাদেশী চালে
ঘুরে বেড়ায়, গ্রামের পথে মেটায় জ্বালা হিয়ার
কলকাতার ছন্নছাড়া উন্নয়নে ভুগে।

জীবনে বহু পেয়েছি স্বাদ, তাই জীবনচিত্র
ব্যাপ্ত দেখি দূর অতীতে আর ভবিষ্যতে।
সাধ মেটে নি, জ্বালাও ঢের, আহিতাগ্নি আশা
আজও অমর, তাই তাকাই আরেক পানিপথে—
নিশ্চয় শেষ শান্তি হবে, পৌত্র বা দৌহিত্র
আমারও তাই হবার সাধ, কারণ ভালোবাসা

ক্রমেই বাড়ে, যদিও রোজ বাঁচার প্রাণপাতে
আমারও প্রাণ দেশের কোটি গলায় বলে, ধিক্।
জানি অচিরে মিলন হবে স্তালিনে খ্রুশ্চেফে,
পিতামহের স্বপ্ন বাঁধা প্রতি নাতির হাতে।
আমারও তাই মনটা ছোটে আরেক স্পুৎনিক,
শূন্যে নয়, মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে॥

৩।১।৬১

যেন ফিনল্যাণ্ড স্টেশনে

দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, ধরো গেছি আমরাও, হাওড়া স্টেশনে।
বম্বে কিংবা দিল্লী মেলে, ওরই মধ্যে, কিছু ধুমধাম,
কুলপি-কামরা আর খানার ব্যবস্থা অন্তত কিছুটা ছিমছাম।
গণ্যমান্য লোক যান রাজধানী, গরিব চাকুরে যায় নিজ কর্মস্থানে,
—দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, রাজন্য বা ধন-নেতা, অথবা কেরানি
ছুটির মেয়াদ-অন্তে চলেছে দপ্তরে কেউ লোকসভা কেউ-বা কংগ্রেসে,
সুস্থ বা অসুস্থ দেহে কিংবা-বা-এবং-মনে, সর্বভারতীয় নানাবেশে,
কেউ হিমে কেউ ঘামে নানান্ ধরনে, সকলেই জানি
একই ট্রেনে সকলেই দিল্লী চলে, বহুভাষী হিন্দির সাগরে
সবাই বিচ্ছিন্ন লক্ষ দ্বীপে দ্বীপে, ভিন্ন আর দূর।

দৃশ্যটা করুণ লাগে, হয়তো বা ছাপোষা বাঙালি ছেলে হাত ধরে,
বিচ্ছেদব্যথায় ভাবে প্রবাসীর স্বাস্থ্যের উদ্‌বেগে, ভাবে ঘরে
স্বস্তি ভালো, ঘনিষ্ঠের নিশ্চিতিতে ভাবে বেকসুর
কি হবে এ উন্নয়নে, তাই চোখমুখলাল, ভাবে একী গেরো!
বাপের ব্যথায় থাকে পাদানিতে, প্লাটফর্মে, দরজাটা ঘিরে
অনেকেরই ছেলেমেয়ে, গণ্যমান্য বা সামান্য লোকেরও,
যারাই দিল্লীর যাত্রী নানান্ শ্রেণীতে নানা আদর্শে, ফিকিরে

—করুণ বিদায়, তবু দৃশ্যটা দুর্লভ নয়, প্রায় নিত্য দেশের বিদায়,
গরিবের চাকুরের নির্বিত্তের নেতাদের দেশ প্রায় রেল-পাতা প্রতীক যেখানে,
গৃহ আর গন্তব্যের লক্ষ্য আর উপলক্ষ্যে বিচ্ছিন্ন ব্যথায়।
তাই কি দেশের ছেলেমেয়ে থাকে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে, যেন ফিনল্যাণ্ড স্টেশনে॥

৭।৮।৫৯

হাওয়ায় যেমন

শক্তিকে বড়ই ভয়, শক্তি কিংবা শক্তির লুব্ধতা।
অথচ এও তো জানি : শক্তির সাহায্য বিনা কিছু সাধ্য নয়।
এ যেন বৃষ্টির মুখ চেয়ে থাকা,
শেষে যবে যদি বৃষ্টি হয় সে ভাসায় বন্যাস্রোতে,
কোথাও বা মৃত্যু আনে দানবিক অণুর খেয়ালে,
দুর্মূল্যের পণ্য জলে, অগ্নিমূল্যে অতিবৃদ্ধ শিশু-দেশে
সস্তা থেকে যায় পঞ্চবর্ষব্যাপী জীবন, জীবিকা।
শক্তির পূজারী নই কোনো দিন, শাসনের অর্থের ক্ষমতা
দূরে পরিহার করি,
একমাত্র মানুষে ব্যক্তিত্বে মনুষ্যত্বে কিনা
আমাদের মনের বিহার,
এমন কি আচার্যের ভার— শিক্ষায় বা অধ্যাত্মেই
কোনো দিন করি না স্বীকার মুক্ত মনে।
মেনেছি মনের শক্তি, যত বিহ্বলতা থাক
মননে তো নেই বিভীষিকা।

অথচ এ মন, সেও ভয়ানক, শুদ্ধ মনের রুদ্ধতা
কম অত্যাচারী নয়, স্বাধীন মনের মোহ
কত অনাচার করে, কত না কর্তব্যে ফাঁকি দেয়,
স্বার্থে কত স্বপ্ন বোনে, ক্রমাগত নিজেকে বাঁচায়
অন্যকে বঞ্চিত ক'রে।
এমন কি প্রেম, তা সে ব্যক্তিক বা মানবিক
যে ইস্পাতে প্লাটিনমে গড়া হোক
সেও তো আপন জোর অন্যের বা অন্যদের মনে
চাপায় ব্যক্তিত্বগর্বে প্রেমের পরম দর্পে প্রচণ্ড দাবিতে,
মানবিকতার নিষ্ঠুর সন্ত্রাসে, আদর্শের বিদ্যুতে ধারায়
শত বাধা শত শত্রুব্যূহ ভেঙে দেয়
নিজ মহিমায়, প্রেমের বিপ্লবী তেজে।

তারপরে, এক দিন, অন্যজন অথবা অন্যেরা
ভোগ করে যাকে বলে প্রতিক্রিয়া
প্রেমের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিত্বের মহাদ্বন্দ্বে জানায় বিদ্রোহ।
শক্তি বড় ভয়ানক, যে কোনো রকম শক্তি প্রয়োগের
যে কোনো সুযোগ।

শুধু বুঝি জড়ের উপরে যে কর্তৃত্বে
মানুষের একমাত্র প্রাকৃতিক জয় :
রেখা-রঙে কাগজে খাতায় কাঠে ব্রঞ্জে মাটিতে পাথরে
সুরে শব্দে ভঙ্গীতে বিন্যাসে,
সেই রচয়িতা শক্তি সেরা,
সেই শুধু ক্ষতিহীন ন্যায়নিষ্ঠ আত্মস্থ উদার।
নাকি সেও ভয়ানক আজ অতিবৃষ্টি কাল অনাবৃষ্টি সেও অভিশাপ ?
উৎস তার যৌবনের আত্মরতি, অন্তে শুধু বর্ধিষ্ণুর বৃদ্ধ অহমিকা ?

শক্তি বড় ভয়ানক, হোক যত আবশ্যিক, সিদ্ধকাম, দুর্নিবার ;
তার চেয়ে ভয়ানক অনভ্যস্ত শক্তির লুব্ধতা।
শক্তিকে ছড়াব কবে জনে জনে ঘরে ঘরে দেশে দেশে
হাওয়ায় যেমন বাষ্প তাপ হিম থাকে স্তরে স্তরে !

ঘুমাবে সেদিন

চোখের জলে ভিড়ের আরতি
আশা তার সার্বিক স্থখের
সচ্ছলতা, সব মানুষের ;
যাতে বাঁচে সবাই স্বাধীন,
দুঃখে স্থখে শুধু আত্মবশ,
ভাষা নয় দাসের মুখের,
পরবশ বুকের তুষের
নিরুপায় আগুনে নিকষ—

তাই রাজনীতিতেই গতি।
মুক্তি চায় ব্যক্তিত্বে সবার,
ঊর্ধ্বশ্বাস তাই তার দিন,
স্বপ্নহীন তাই তার রাত,
অতৃপ্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
খোঁজে শুধু সমগ্রের জয়,
মুষ্টিবদ্ধ শপথের হাত
সে রাখে না স্নিগ্ধমৃদু গালে
কিংবা কোনো বুকের আশ্রয়ে,
সন্ন্যাসী সে অথচ সাধনা
ইহলোকে মর্ত্য আরাধনা,
স্তব তার জনতার তালে।

নির্মাতা সে, শিল্পী সে, ভাস্কর
জীবনের মূর্তি পরস্পর
মানুষে মানুষে হাতে হাতে
গ'ড়ে দেবে প্রেমের সংজ্ঞাতে ;
কর্মে তার শিল্পীর আকৃতি,
সর্বদাই অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা ;

প্রেমিক সে, বহু আলিঙ্গনে
নৈর্ব্যক্তিক একাত্ম বিভূতি
খুঁজে মরে ব্যক্তির স্বাক্ষরে।
যেইদিন তার ভালোবাসা
ঘর পাবে, ঘুমাবে সেদিন,
ঘর পাবে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

আন্দ্রমিদা

তোমার প্রবল হাতে তুলে দিই এই অবসাদ, আন্দ্রমিদা,
তোমার আয়ত চোখে চোখে জ্বালি আমার বিষাদ,
কালের মশালে ক্ষণিকের এই কালো অবসাদ
তোমার লক্ষ নীহারিকা-জ্বালা চোখে।

উল্কা জাগাও শহরের শবে পাঁচটা-ছটার ট্রাফিকে,
তারায় তারায় জ্বালাও জীবন জীবনেরও চারিদিকে
বিদ্যুতে ধাও নিরালম্বের ও পূর্বাপরে
আকাশের মতো কালের আবেগে নাক্ষত্রিক চোখে।

আশার কার্যকারণ জাগাও ক্লান্তিতে,
বৈকালী করো উষায় মুক্তিসিক্ত,
একটি সন্ধ্যা ইতিহাস করো সারাটা জীবনে দীপ্ত,
যেমনটি হয় পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় সূর্যের চোখে চোখে,

যেমনটি হয় তারায় তারায় লেগে সংঘাতে ক্রান্তিতে
নতুন মানুষ নতুন পৃথিবী নতুন সূর্য, আন্দ্রমিদা।

কর্তার ভূত

কেন এ ভূতের ভয়? কর্তার ভূত-কে
বলো না সাবেক সুরে: ভূত মোর পুত্।
কি হবে হরদম এই রামনাম ব'লে?
যদিই কর্তা আজও লাফ দেন পুট্‌কে
অথবা ফচকে ঘাড়ে, বলো তো তাহ'লে
সমুদ্রপারের কোন সাহেব অদ্ভুত
আংরেজি মন্তরে আজ নামাবে ভূতকে?

সে কবে মিশেছে তার শ্মশানের ছাই
সারাটা দেশের সারা বিশ্বের মাটিতে।
ফুঁ দিলেই উড়ে যায়, এত ঘটা ক'রে
কাকে যে তাড়াও তুমি তাড়ীয়াল ভাই রে!
হাওয়াকে তড়পে তুমি যন্তর মন্তরে
ভাবো কি গলিয়ে নেবে গলির ভাঁটিতে?
রাম বা লক্ষ্মণ কবে খুঁটে খায় ছাই?

ছাড়ো এ ভূতের খেলা, ঘাটে বা কবরে
কর্তার টিকিও নেই, গোরস্তান তুলে
ভূতকে পাবে না, ভূত ছেড়ে বলো কানে
রামনাম সৎ হায়, সততার জোরে
দেখবে ভূতের ভয় সোজা যাবে ভুলে
কারণ ভূতের মাথা তোমারই গর্দানে।
ভূত কি থাকে রে বোকা, শ্মশানে কবরে?

ক্ষেমাঘেন্না ছেড়ে দিয়ে বলো সোজাসুজি:
চাও সুখ চাও স্বস্তি সচ্ছল আরাম।

তবেই দেখবে কর্তা নিজেই কবরে
পাশ ফিরে নিরুদ্দেশ, এবং যা বুঝি
দুনিয়ার সব লোক তোমার জবরে
নিশ্চয় ফেলবে হাঁফ— আরে রাম রাম !
আমরাও ওরে দাদা সুখ স্বস্তি খুঁজি ॥

৭।১২।৬১

জলের রাগ

দেখেছি জলের রাগ, বেগের আগুনে মাটিলেপা
মাথা কোটে পাথরে বালিতে তোড়ে সে যে কী না করে!
ঘোঁট করে, ফোঁসে ফোলে, নিজের ধর্মই ভোলে ক্ষ্যাপা,
মাখে কাদা ছাই-ভস্ম, নুড়ি ভাঙে ফুৎকারে শীকরে।

জলের অদ্ভুত রাগ, গদা হানে লৌহ ভীমসেন
আর হিড়িম্বানন্দন যেন ভাঙে অন্ধকার বনে
উরু বা গর্দান! কিংবা যেন মল্ল কেউ একাই খোঁজেন
ছায়ায় আপন শত্রু, যত ছায়া সরে তত মনে
রাগ গর্জে, দুস্থ চৈতন্যের রাগ, যেমন বারুণী হাঁকে
হিরোশিমা সাহারায়— কিংবা আরো মোটা মেগাটনে
আর কোথাও জুজুমানা বোমা ছোঁড়ে।
কোয়েলের ক্ষিপ্র বাঁকে
ঘূর্ণির উলঙ্গ শক্তি, আপন শক্তির ঘোলা লোভে
দেখেছি নদীর সত্তা— স্রোতের প্রতীকই বুঝি ডোবে॥

১১।১২।৬১

কোনো পেত্রফ্ যেন পেত্রফার জন্যে

তবু হার মানা নয়, ক্রন্দসীর জলে
সূর্য হোক ডুবুডুবু, তোমার আমার
আকাশে আকাশে শুনি তরঙ্গ আঘাত,
সূর্যহীন তমসার, তবু বারবার
বলে যাব— যতই না শূন্যে জলে স্থলে
যবনিকা মেলে ধরে মূর্খ অন্ধকার,
আলোর মহিমা দেখি অতল অপার।
তাই স্থির চোখে দেখি যত পদাঘাত
ধূসরের দাস করে শুভ্রকে কালোকে
সবই ব্যর্থ। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্ত বা রাত্রে
মধ্যাহ্নের অগ্নি রাখি যে রক্তিম পাত্রে
সে হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের অসীম আকাশ
বহ্নিতে অতন্দ্র, প্রতি প্রাণীতে পদার্থে
যে দীপ্তির দিন আর রাত্রির আভাস
সে বিদ্যুৎ রক্তে ধরি, মন্দকে ভালোকে
সূর্যঘট জেলে জানি। আঁধারের স্বার্থে
এ আলোর মৃত্যু কোথা? সূর্যাবর্ত ছেড়ে
সমস্ত আকাশ জুড়ে নয়নাভিরাম
চোখ বোজো, দেখ মুঠি মুঠি আলো পেড়ে
তোমার হৃদয় ভ'রে আমিই দিলাম॥

পৃথিবীর নববধূ

পৃথিবীর নববধূ আজ প্রৌঢ়া সচ্ছল গৃহিণী,
তাই পরিণত মুক্তি বিলায় অকাতরে,
সাবালক আপন সংসার কর্তৃত্বে ঢাকে না।
ছেলেমেয়েদের স্বত্বে সে বেঁধে রাখে না,
ছেড়ে দেয় নব নব নিজ নিজ ঘরে,
সাজায় যে যার ঘর, নিজেরাই করে বিকিকিনি।

হয়তো বা মায়া জাগে, মমতার ক্ষমতার লোভ,
কর্তার অভ্যস্ত কানে নিভৃত বিশ্রামে আলোচনা
মাঝে মাঝে হয় নাকি! তবুও দাম্পত্য শান্তি
বিরাজে গৃহিণী আর কর্তার বপুতে, তার কান্তি
ছেলেরা পেয়েছে, আর একমাত্র কন্যা গোরোচনা।
অবশ্য আপদ আছে, বিপদ, অসুখ, মনোক্ষোভ।

তবু ভালো লাগে এই পৃথিবীর সম্পূর্ণ যৌবন,
সন্তানেরা সবাই স্বাধীন, অথচ স্নেহার্থী,
যায় কাজে কৌতূহলে দেশে দেশান্তরে,
নিজ নিজ নব নব ঘরে, গ্রহে গ্রহান্তরে,
যে যার চিন্তায় সংসারেই মনোযোগী, অথচ সবাই প্রার্থী
বিশ্বব্যাপ্ত সদ্ভাবের, সকলেই জনসাধারণ ॥

১০।২।৬২

বরং সে আর তার বোন লেনার জঙ্গলে

মাঝরাতে বাপ ফেরে। কলকাতার রাস্তায় যখন
ক্লান্ত ফাঁকা হাহাকার হঠাৎ হঠাৎ মোটরের চীৎকারে
দম পায়, তখন বাপটি ফেরে, না শ্মশান না, অন্য আড্ডা থেকে,
তখন সে বিছানায় জানলার দিক থেকে ফেরে, যেন নিজেকে গোপন
ক'রে দেয়ালের রঙে, চুপচাপ চোখ মেলে কিংবা চোখ ঢেকে
অস্পষ্ট আবেগে ভাবে, ভাবে : কি যে ভাববে এবারে।
মা তখন ঘুমে কিংবা ঘুমের ওষুধে অসাড় বালিশে
ওই ঘরে কি যে ভাবে, আপন শিশুর মনে ভাবে তা ছেলেটি,
মা যে কেন অবিশ্রাম কাজে যায়, কোথা যায়, সে কোন আপিসে
ঘুরে ঘুরে নিজেকে যে কালি করে, সে যখন দুপুরে বাড়িতে
শুয়ে থাকে কথামতো পাশে মা আসে না, না, মা খুবই ভালোবাসে, ইলিশের পেটি
নিজে বেছে তাকে দেয়, নিজে গাদা কাঁটা খায়, বলে : জিভ চাপিস্ মাটীতে
দেখবি ইঁদুর দাঁত ফেরত দেবে না। মা-ই বলে, উত্তরাধিকারী
সেই নাকি, বাবাও চেঁচায়। কলকাতার রাস্তায় যখন অনেক ভিখারী

ঘুমোয় অনেক লোক, মড়া যায় শ্মশানের দিকে হঠাৎ চীৎকারে
তখন সে চুপচাপ ভাবে : কাল ভোরে আর ইস্কুলে যাবেই না সে,
মা তাকে ভালোই বাসে, বাবাও হয়তো তাদের ভালোই বাসে,
সে আর বোনটি নাকি মা-বাবাকে বন্দী রাখে, সেই উত্তরাধিকারে
উত্তর দেবেই না আন্টিদিদিমণিদের, বরং সে আর তার বোন
চলে যাবে, শ্মশানে না বহুদূরে, লেনার জঙ্গলে, দুজনেই ভালুকশিকারী।
কিংবা মোড়ে, ভোটের মিটিঙে, দুজনের দুহাতেই ছবিআঁকা ফ্ল্যাগ ভারী ভারী।

তুষারে আগুন জ্বালে

'For the sweetest, wisest and of all my days and lands and this
For his dear sake.— ' *Whitman.*

তুষারে আগুন জ্বালে, অন্যহাতে ঢালে মানুষের প্রেমে
শীতল বাদলধারা শূন্যমরুদাহে। এই ইতিহাস।
প্রেম ঘৃণার বিদ্যুতে বজ্রে সমস্ত আকাশ
একাকার করে দিলে একটি নিশ্চিত নীলে।
শুনি তারই রিমঝিম শব্দের আখর দূর দেশে যুগান্তরে মনের হরিষে।

মানুষের দ্বন্দ্বের জগতে, ক্ষমতার সংঘর্ষে অটল
সে মানুষ, সে আকাশ, মৈত্রীর ক্রন্দসী তার একাগ্র দৃষ্টিতে।
স্থিরলক্ষ্য করুণায়, বদ্ধমুষ্টি উত্তোলিত হাতে
প্রচ্ছন্ন সংহত এক আলিঙ্গন আবিশ্ববিস্তৃত,
ইতিহাস বিরাট ললাটে ত্রিনয়ন, নির্নিমেষ দুই চোখে
মানুষের ভালোবাসা, সর্বমানুষের একাত্ম চেতনা।

বৃথা হত্যা, উন্মাদের বৃথা চেষ্টা।
ইতিহাস কে কার গুলিতে ভেঙেছে কখনও ?
পৃথিবীর মানুষ অমর, চোরাগুলি বৃথা তাই।
একটি মানুষ, দুই চোখে জর্ডনের জল ফাঁসিকাঠের উপরে
সংবৃত, বদ্ধমুষ্টি উত্তোলিত হাত বিথারে শান্তির ছায়া
বোধিদ্রুমে শাখায় পল্লবে অক্ষয় অমেয়।
ত্রিনয়নে ইতিহাস, আলিঙ্গন দু হাতে সংহত।
মৃত্যু নেই। বৃথা হত্যা। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস
একটি মানুষে একাগ্র প্রতীক। বৃথা হত্যা।

মৃত্যুহীন প্রাণ, সারা দেশে, দেশে দেশে, সারা বিশ্বে একটি আকাশ
অখণ্ড একটি হাওয়া, চোরাগুলি বৃথা তাই আজ,
(বৃথা যাবে আণবিক দানব চেষ্টাও, আজ নয় কাল,)

মানুষ অজেয়, নির্বোধ বিমূঢ় অসহায় আজ সারা পৃথিবীর
সামান্য মানুষ, সাধারণ লোক, অমর আকাশ আজ
প্রতি চিদম্বরে উত্তরাধিকার, সাধারণ্যে জনসাধারণে
মৃত্যুহীন প্রাণ, যাতে কোটি কোটি প্রাণে দেশে দেশে
তুষারে আগুন জ্বালে, মরুদাহে ফলায় ফসল, এই আজ ইতিহাস,
লেনিন অমর কোটি কোটি লোকে, যেন বা কৈলাস
সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, শান্তির প্রেমিক এক জীবনের দোষেগুণে প্রেমের ইস্পাতে ॥

কেন যে লেনিন

চোখে ঝক্‌ঝকে সূর্যের স্মিত হাসি
নিয়ে যায় লঘু স্বচ্ছ আলোয় দূর পামীরের পারে।
হৃদয়ে কি তার আরালের স্রোতে সোরাব উজ্জীবিত ?

কথাগুলি তার গান যেন কথাগুলি
ফাল্গুনী যেন মর্মে মর্মে তারা কী আকুল করে !
কে তার কণ্ঠে দিল এই বিস্ময় ?
ঝরা দেশে এই মরাদেশে সে কি করবে বিশ্বজয় ?

হৃদণ্ড তার পাশে বসা সেও যেন জীবনের অভিযান,
কত উৎরাই চড়াই কত না প্রান্তর,
এক মুহূর্তে ভাস্বর তার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ
প্রাত্যহিকের সমতলে তার ফুলে ফলে নির্মাণ।

তাকে যে দেখেছে, সেই জানে কেন শ্রাবণের
থৈথৈ মাঠে ফের উড়ে আসে আশ্বিন
মাঘের অন্তে বারে বারে কেন অঙ্কুর
কেন যে লেনিন আগুন জাগান্ লেনিনগ্রাদের তুষারে।

সব সমতল একটি বিজয়ী হাস্যে

চোখে বিদ্যুৎ দীপ্ত স্বচ্ছ নির্ভীক,
সে রেখে এসেছে পাহাড়ে যা কিছু দ্বিধা।
চলায় বলায় তীরের ফলকে রৌদ্রের হীরা ঠিকরে।

সে যেন তাতার সওয়ার এক
যেন বা গড়েছে ভাস্কর কোনো গ্রীক,
আতত শরীর এই বুঝি দেবে টংকার!
যৌবন তাকে ডাক দিয়ে যায় নিশ্চিতে,

একটি আস্থা গ'ড়ে দেয় তাকে সিধা পথ।
মনে মনে ভাবি : হে প্রাণের দূত জীবনের দেশে প্রান্তরে
সব রাজপথ পার হয়ে তুমি ইন্দ্রধনুকে বাঁকিয়ে
মেঘের উপরে স্বচ্ছ হাওয়ায় জ্বালবে আবার বিদ্যুৎ?

প্রজ্ঞাপ্রবীণ নয়নে ত্রিকাল, উঠবে আবার শিখরে
যেখানে মিশেছে সব সমতল একটি বিজয়ী হাস্যে?

মেলালেন তিনি মেলালেন— ২১শে জানুআরি

দু কানে আসে গান তো নয় সমুদ্র
ক্ষুধার রাগে অনাচারের জ্বালায়।
গৌরী দেখ মানসহ্রদে কি রুদ্র
তুফান তোলে; কিরাত দূরে পালায়,
হৃদয়ে গান থম্‌কে যায়, মাতে
লক্ষ লোকে কালের সন্ধ্যাতে।

মেলাও কবি লক্ষহাতে মেলাও।

এখানে দিনরাত্রি নীলা ঠিকরে
মাটির ঢেউ চুনিতে আর পান্নায় ;
ইন্দ্রনীল মরকতের শিখরে
ছায়া ঘনায় বঞ্চিতের কান্নায়,
গন্ধবহ থম্‌কে যায়, মাতে
সকাল থেকে রুজির সংঘাতে।

মেলাও ছবি একতারাতে মেলাও।

হিমালয়ের নাম্‌ল চূড়া সমুদ্রে,
লগ্ন যেন নামে অমোঘ বজ্রে,
অথচ ধীরে বৃহতে কিবা ক্ষুদ্রে
পাহাড় যেন প্রজ্ঞা আর ধৈর্যে,
ত্রিকাল যেন থম্‌কে যায়, মাতে
ইতিহাসের দীপ্ত ইস্পাতে।

কোটি কোটি হাতে কৈলাস এক মেলালেন।

যখনই তোমার সত্তায় রৌদ্র লাগে

যখনই বাস্তবে দেখি তোমার সত্তায়
রৌদ্র লাগে, কণাকণা স্ূর্য ওড়ে চোখের তারায়,
তখনই তোমাকে খুঁজি,
দূরে, আকাশের গায়ে, মনে, উন্মুখর গানে,
বইয়ের পাতায় খুঁজি দেখি ছবি, মূর্তিমতী ছবি,
পটে লিখা ছবি।
আর প্রশান্ত আকাশে চোখে মনে মুক্তির নিঃসীমে
বর্ষার আষাঢ় আর আশ্বিনের পরে শুচি হিমে
গ্রহতারারবি গান করে হেমন্তিকা তোমার সত্তার
যথার্থ আখর।
তোমার প্রতিমা পাই তিলেতিলে, বক্ষে বক্ষ, অকপট
চোখে চোখ আলেখ্যর বিশুদ্ধ নৈকট্যে সত্যে যোগাযোগে,
আর পাই দূরায়িত বিরাটের পটে আধৃত আকৃতি,
গুণে ভাগে আর বিয়োগেও,
তোমার প্রাকৃতে নিত্য আনন্দের সত্তার ভৈরবী
মানবিক প্রকৃতির।— যেমনটি সম্প্রীতির রীতি॥

প্রতিবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, সংগঠন

পিতা তার ছিন্নভিন্ন, শকুনি ও শিবার আহার
যাযাবর দস্যুদল-দমনের ব্যর্থ শ্রমে হত।
পূতিগন্ধ ভিড়ে শুধু নতমুখে পরিব্রজরত
সুভদ্রা বা সত্যভামা।
উৎসবের বসন্তবাহার
অশ্রুজলে স্বরহীন। ধ্বংসবহ তুষার-ভৃঙ্গার
ঢেলেছে নৃশংস ঝড়ে কংস বুঝি প্রেতলোকগত।
মথুরার মৃত্যুহীন স্মৃতিভারে ক্লিষ্ট পরাহত
দ্বারকার দীর্ণ পথ, জীর্ণ শীর্ণ পল্লব বৃন্দার।
মাতা তার পথচারী, অন্নের আদিম অন্বেষায়।
দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভবাহনে।
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গী এল শ্রাবণপ্লাবনে।
গলিতবলভী ঘুরে মুক্তদ্বারে যুগান্ত-হ্রেষায়
শুদ্ধ ও সরল শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে!
বসুন্ধরা দেখে তাই, বিশ্বময় বাসুদেব শোনে॥

১৯২২/২৩-এর লেখা, আনাতোল ফ্রাঁসের বিবৃতি ও নোবেল পুরস্কারের টাকাটা সোভিয়েট ইউনিঅনে পাঠানোর খবর পড়ে

সে আকাশ তোমারই আকাশ

বর্ষে বর্ষে কাল কাটে, প্রাত্যহিক, নিঃসঙ্গ, করাল !
বৈশাখীর ঝঞ্ঝা জীর্ণ গ্রীষ্মে শেষে হয় ভস্মলীন,
প্লাবিত বর্ষার গান, শরতের সূর্যাস্ত মলিন,
হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানসমরাল !
জমে ওঠে রক্তবীজ জীবনের অলক্ষ্য অভ্যাস,
থরে থরে গুপ্তচর জলে স্থলে বায়ুহীন মেঘ।
শাণিত বিদ্যুতে চেরে ঘনঘটা, স্বনিত আবেগ,
পুঞ্জে পুঞ্জে ঘেরে ক্ষোভ, মনান্তরে ছিঁড়ে যায় ব্যাস—
ছিন্নভিন্ন হাওয়া ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, ডোবায় আকাশ,
ধুয়ে যায় মাঠক্ষেত, গাছপাতা, নদীর জঞ্জাল,
সূর্যালোক স্বচ্ছস্নাত রেঙে ওঠে দিক্‌চক্রবাল,
ছেয়ে দেয় আদিগন্ত ইন্দ্রধনু বিরাট আকাশ।
সে অতলনীলে স্তব্ধ স্মিতহাস্য কালের রাখাল
পাহাড়ের নীল চূড়া। সে আকাশ তোমারই আকাশ ॥

৭।১১।১৯৩৬

গঙ্গার দুপারে

নক্ষত্রেরা উর্ধ্বশ্বাস। উপদ্বীপ সমুদ্রে ঊর্মিল।
লবণ-ফেনায় দৃষ্টি অন্ধ। অশ্রু শুকায় নয়নে।
বাসরে আঁধার জমে। উর্ধ্বশ্বাস চিন্তারা উধাও।
সহিষ্ণু স্ফীংক্স্‌-ও তার কান পাতে সাহারার পানে।

বাতি নিবু-নিবু। রক্তধারা বুঝি তুহিন নিশ্চল
বিরাট কৈটভ-দেহে। ক্রীড়ায়িত ওষ্ঠাধর উবে
স্ফীত হ'য়ে ওঠে মরুভূর নীল হাসিতে পাণ্ডুর।
রাত্রি নেমে যায় সেই ভাঁটার প্রহরে ডুবে ডুবে।

সমুদ্রেরা আন্দোলিত মরক্কোর হাওয়ায় হাওয়ায়।
সিমুম বইছে। হিম সুমেরুর নাক ডাকে ঘুমন্ত তুষারে।
বাতি নিবু-নিবু। "ভাবীকথকে"র আদি পাণ্ডুলিপি
শুকায় এবং ওঠে উষা ঐ গঙ্গার দুপারে॥

শান্তি

ক্ষমার কথা ওঠেই নাকো
কে কাকে করে ক্ষমা !
আজ তোমার পূর্ণিমায়
কাল আমার অমা।

আজ তোমার অমাবস্যা
কালকে পূর্ণিমা
তাই বলে কি হৃদয় জ্বেলে
জ্বালবে হিরোশিমা ?

প্রাণের চরে শান্তি চাই,
জানি আপনপর,
আমরা জানি ঝরনা কেন
শুকনো মরা চর।

খুঁজি নি নীল চূড়ায় কালো
রসাতলের দিশা।
ভল্‌গাপারে উষায় কেন
মিসিসিপির নিশা ?

আমার হাত রইল মেলা
মধ্যে থাক্ নদী,
এপার ওপার একটি ডাঙা—
হাত মেলাও যদি।

আমাদের কবিতা প্রত্যাশা

এখানে সবাই দেখি মাটি আর মাটির মানুষ।

অনেক শতাব্দী বেয়ে মাটির চেতনা আজ বুঝি সোঁতা বালি,
সজীবের সবুজের সরসের মরুভূমি
নির্জলায় নিষ্ফলায় গেহেনায় গোমোরায়।
এরা কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ তাপ সয় অবহেলে,
হয়তো যা ধনিক বোমার উন্মাদ দাহেরই মতো ভয়ংকর—
শত অভ্যাসিকতায় ভারতীয় বিষাদ সত্ত্বেও।

প্রত্যাশা স্বপ্নের শিকায় তুলে আগত বন্ধুও ভাবে খালি
এই মাটির ক্লান্তিতে কখন্ নামানো যাবে মেঘের পৌরুষ।
আর বজ্রে ও বিদ্যুতে ঐ এল কে মৌসুমী আরবার!
হয়তো বা সাময়িক বন্যার বিভেদহীন প্রাবল্য শর্তেও
আসে তৃষিত শান্তির জল সকলের,
আপাতদৃষ্টিতে নয়ছয় কারো কাছে কখনো বা প্রলংকর।

তারপরে রুক্ষ দগ্ধ ডুবে যায়, পাথরে কাঁকরে আকাশকুসুম
আর শস্য জাগে শষ্প ফল ফুল আর ঘরে মাঠে মানুষ, মানুষ
তাকায় তখন সেই মরিলে না মরে রাম অমর্ত্য আশায়।
অনেক শতাব্দী ভ'রে বছরে বছরে যে আশা অক্ষয়
সেই বুভুক্ষায়, কারণ আশাই যেন নশ্বরের শ্রেষ্ঠ ক্ষুধা,
অত্যন্তাভাবের জয়।

শহুরে শরীরে এই মাটি-আকাশের উদ্যত ভাষার ভাপ লাগে,
অসহ্য গরম, এমন কি দাহ নেই, নেই বিশ্বযুদ্ধ অন্তর্যুদ্ধ
হয়তো বা নেই সেই সুস্পষ্ট গৌরব।
শুধু আছে বীজ্রকম্প্র দৈনন্দিনে বিশৃঙ্খল প্রতীক্ষা—গুমোটে যেন অবশ বসুধা,
চায় কিছু জল, সময়ের নিয়ন্ত্রণে

যেমনটি, ধরা যাক্, একুশ বাইশ থেকে চেয়েছিলেন লেনিন
প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজ কালজয়ী প্রশান্ত অটল।

তাই বুঝি পুবে হাওয়া! আর উত্তরে পশ্চিমে উধাও আশ্বিন
ডেকে আনে দক্ষিণের সামুদ্রিক মিতাদের
সপ্তাশ্বের শতবর্ণ বাদী-প্রতিবাদী মহিমার ঐক্যতান :
হে বন্ধু এবার আর নয় জীর্ণ বিবাদীর গান!

আর বাহুবন্ধ সিক্তবাস পৃথিবী-ক্রন্দসী নিয়ে আসে ধানী রঙে
হেমন্তের দিন।
শুনেছি তাই তো এনেছিলেন লেনিন।

তারই হাওয়া গায়ে লাগে অধমর্ণ শহুরে শৌখিন উল্লাসে সন্ত্রাসে।
আর মর্মরিত মনে হয়—এখানেও বাঁচে বুনিস এপাশে ওপাশে
পঞ্চাশৎ বহু বীর।
এমন কি একদা বিশ্বের মুক্তি-প্রিয় দিউগাশভিলিও।
লক্ষ লক্ষ বহু মুখ।
(বুখারিন মলোতফ মানবেন্দ্র ভরশিলফ্ বুদিওনি ট্রট্স্কি ইত্যাদি!)

মাটিতেই প্রাণ জাগে আকাশের বক্ষলগ্ন পৃথিবীর নবভাষ্যে।
যে মাটিতে অক্টোবর উপনীত দ্বিজ নভেম্বরে।
আর লক্ষ্মী পূর্ণিমারা হাস্যে-লাস্যে ঘর ভরে কোজাগরে॥

৭-৮।১০।৬৭

—